ছোট্ট একটু রাত্রিসংগীত

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

আজ সকালেও ২৭ কি ২৮ ডিসেম্বর, ট্রিনকাসের ব্যাণ্ডের ছেলেগুলো এসে ধরেছিল, সনি, প্লিজ এই একটা মাস বাজিয়ে দাও। ক্লায়েন্টরা মিস করছে তোমার বাজনা। এভরিওয়ান ইজ আস্কিং, হোয়্যার ইজ লোবো? রিয়েলি, ইউ কান্ট ডু দিস টু আস!

লোবো বসেছিল ওর দোতলার ফ্ল্যাটের সিঁড়িতে। সিঁড়িটা ফ্ল্যাটের বাইরে দিয়ে তিনটে বাঁকে নেমেছে। রাস্তা থেকে উঠতে প্রথম যে বাঁকটা, ওইখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বাবা, টোনি লোবো, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে। প্রথমে বুক চেপে ধরল, একটা প্রবল চিৎকার দিল ‘সনি!’ আর তারপর ওই যে শুয়ে পড়ল সিঁড়িতে আর উঠল না। বড়ো বড়ো, ঢেলা ঢেলা চোখে মাতাল বাবা অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল রাতের আকাশে তারামন্ডলীর দিকে। সনি গিয়ে যখন মাথার কাছে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, কী হল, বাবা? শরীর খারাপ করছে? বাবা আঙুল তুলে তারা দেখিয়ে বলল, ওরা আমায় ডাকছে, সনি। তারপর ওই তারা দেখতে দেখতে চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল।

সিঁড়ির দ্বিতীয় বাঁক থেকে শেষ হাত নেড়েছিল প্রিসিলা। ওহ কী অপূর্ব হাত নাড়ার দৃশ্য সেটা, লোবো কোনো দিনও ভুলবে না। দৃশ্যটা মনে মনে তারিফ করতে করতে কী আফশোস তখন ওর—শিট! কেন আমার একটা ক্যামেরা নেই দৃশ্যটাকে ধরে রাখার জন্য! জড়িয়ে ধরে আদর, চুম্বন ও চোখের জলের পালা তো শেষই হয়ে গিয়েছিল, হাত নাড়ার বাইরে আর তো কিছু করার নেই তখন। বাইরে গেটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, প্রিসিলা হাওড়া স্টেশনে যাবে। সেখান থেকে বম্বে। একটা শীতের মরসুমের জন্য ও গাইবে বম্বের শেরাটনে। তারপর ফিরে এসে...

না, ফিরে এসে বিয়েটা হয়নি লোবোর সঙ্গে, কারণ প্রিসিলা ফিরেই আসেনি। পরিবর্তে একটা চিঠি এসেছিল :

প্রিয়তম সনি, এই চিঠি পড়ে তোমার বুক ভেঙে যাবে জানি। তবু লিখছি, কারণ তোমাকে আমি এখনও সেভাবেই চাই যেভাবে বিদায়ের দিনে চেয়েছিলাম। আমি জানি কলকাতা ছেড়ে আসা তোমার পক্ষে নিঃশ্বাস নেওয়া ছেড়ে দেওয়ার মতন। তবু বলছি, প্লিজ বম্বে এস, শুধু আমার জন্য। আমাদের ভালবাসার জন্য। এখন আর কী আছে কলকাতায় তোমার? তোমার মা তো দিব্যি মানিয়ে নিয়েছেন বৃদ্ধাবাসে। মাঝেমধ্যে আমরা নিশ্চয়ই কলকাতা ফিরব, ওঁকে দেখব, সব বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে মিশব, একটু-আধটু গান-বাজনা করব ট্রিনকাস, মুল্যাঁ রুজ, প্রিন্সেসে...কী বলো? কলকাতা চিরকাল আমাদের কলকাতাই থাকবে। কিন্তু এখন, ফর নাও প্লিজ চলে এসো বম্বে। যা-কিছু ঘটার সব এখানেই ঘটছে, আমাদের গান-বাজনার জন্য টাকা উড়ছে হাওয়ায়, এখান থেকে এঙ্গেলবার্ট হাম্পারডিঙ্ক নামে একটা ছেলে লণ্ডনে গিয়ে কী নামটাই না কামিয়েছে! আর আমি শুধু ভাবি তোমার কথা, ঈশ্বর কী জাদুভরা আঙুলই না তোমায় দিয়েছেন! বম্বের সমস্ত নামকরা পিয়ানিস্টকেই তুমি ফিঙ্গারিঙ্গের লেসন দিতে পারো। ইউ ক্যান রিয়েলি বি দ্য

বেস্ট পিয়ানিস্ট অব ইণ্ডিয়া। তা হলে কেন পড়ে আছ কলকাতায়? আর এই সবও যদি কিছু না হয় তোমার কাছে, অ্যাটলিস্ট তোমার প্রিসিলা তো আছে। কাম ফর মি, ডার্লিং, ডিয়ারেস্ট, জাস্ট কাম, আই অ্যাম ওয়েটিং।

সেদিনও ঠিক এইখানে বসে চিঠিটা পড়েছিল লোবো। শেষে রাগে, দুঃখে, অবরুদ্ধ কান্নায় সেটাকে দুমড়ে-মুচড়ে, দলা পাকিয়ে টেনিস বলের মতো ছুড়ে দিয়েছিল অদূরে বাঙালি খ্রিস্টানদের বস্তির চালে।

সেই থেকে লোবো এইখানে বসে চোখ রাখে সিঁড়ির তৃতীয় বাঁকটার উপর। ওর জীবনে এর পরের কোনো বড়ো ঘটনা ঘটলে হয়তো ওইখানেই ঘটবে। হয় ওখান থেকেই কেউ গড়িয়ে পড়বে নীচে, নয়তো উঠে আসবে উপরে। বস্তুত, ওইখানে দাঁড়িয়েই ট্রিনকাসের ছেলেগুলো আজ মিনতি করছিল, সনি, প্লিজ ফিরে এসো।

সিঁড়ির তৃতীয় বাঁকে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছিল ওরা, কিন্তু লোবোর একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি ব্যাপারটাকে। ও সিগারেট খেতে খেতে ওদের কথা সব শুনল, তারপর পুরো প্রসঙ্গটাকে বদলে দিয়ে খুব ক্যাজুয়ালি জিজ্ঞেস করল, মোরিন কেমন আছে? কেমন গাইছে?

ছেলেদের মধ্যে একজন উত্তর দিল, ফাটাফাটি গাইছে এখন মোরিন। যা কে সেরা সেরা করে! ইস তুমি যদি সঙ্গে থাকতে পিয়ানোয়!

লোবো তখন জিজ্ঞেস করল, বুড়ো সিলভিওর পায়ের বাত কীরকম? টিবেটান ওষুধে কিছু কাজ হল?

ছেলেরা তখনই বুঝে গিয়েছিল একে ফেরানো দায়। ওরা ওর জন্য আনা দুটো ‘লাকি স্ট্রাইক’-এর প্যাকেট ওর হাতে জমা দিয়ে চলে গেল। লোবো ফের মন দিয়ে দেখতে লাগল সিঁড়ির তৃতীয় বাঁকটাকে...আর ওরকম অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎই মনটা কীরকম কান্নায় ভরে গেল। ওর মনে পড়ল ওই তৃতীয় বাঁকটায় দাঁড়িয়ে সেই ছোট্টখাট্টো বাঙালি কলেজ যুবার আড়ষ্ট নিবেদন, মিস্টার লোবো, ক্যান আই কাম আপ অ্যাণ্ড টেক টেন মিনিটস অব ইয়োর প্রেশাস টাইম?

লোবো সেদিন প্রভূত মদ্যপান করেছিল, ভালো করে দেখেওনি ছেলেটার দিকে। তার উপর সন্ধ্যেকাল, পিছন ঘুরে ছেলেটার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা বলারও সৌজন্য দেখায়নি লোবো। চাবি ঘুরিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে খুলতে বলেছিল, দশ মিনিট? এমন ভর সন্ধ্যেবেলায় দশটা মিনিট কি চাট্টিখানি ব্যাপার? না বাপু, তুমি পরে একসময়...।

লোবো কথা শেষ না করেই ঢুকে গিয়েছিল ঘরে। যখন সুইচ টিপে অন্ধকার ফ্ল্যাটে আলো জ্বালল, দেখল ছেলেটাও গুটি গুটি এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের দরজায়। হাতে কী সব চৌকো চৌকো খাতাপত্তর, সেগুলো দেখিয়ে বলল, আপনি একবারটি এগুলো দেখুন, তারপর পছন্দ না হলে আমি চলে যাব।

লোবোর বেশ মেজাজ চড়ছিল, সেটাকে সংযত না করেই বলল, দ্যাখো বাপু, গান-বাজনা আমার কাজ। বাড়িতে রেকর্ড রাখার জায়গা নেই। দয়া করে আমাকে এর-তার পুরোনো রেকর্ড গচাতে চেষ্টা কোরো না।

লোবো একটা সিগারেট ধরিয়ে ধপাস করে বসে পড়েছিল বেতের সোফায়। প্রথম ধোঁয়াটা হাওয়ায় ভাসিতে দিয়ে উপরে চাইতে দেখল যুবকটি মাথা নীচু করে কীরকম অভিমানী চোখে চেয়ে আছে মাটির দিকে। লোবোর সঙ্গে

চোখাচোখি হতে বলল, আপনি যা ভাবছেন আমি তা নই। আমি আপনাকে রেকর্ড বেচতে আসিনি, দেখাতে এসেছি। আর এসব রেকর্ড এর তারও নয়, আমার বাবার। আর এগুলো কিছু গানের বই যা, আমার ধারণা, আপনার দেখা দরকার।

লোবো ছেলেটার হাতের পুরোনো ৭৮ আর পি এম রেকর্ডগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, এসব তো খুব পুরোনো রেকর্ড, এতে কাদের গান?

ছেলেটা রেকর্ডগুলো লোবোর সামনের সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, মোজার্ট, শুমান, ফ্রানজ লিস্ট। আর এই বইগুলো...

ছেলেটার কথা তখনও শেষ হয়নি, তড়াক করে ওর সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে লোবো বলল, তুমি আগে প্লিজ বসো, হোয়াট এভার ইয়োর নেম...

ছেলেটা উত্তর দিল, অমিত রে। বাট সিম্পলি কল মি অমিত।

লোবো ওকে বসিয়ে, নিজে বসে, সিলিঙের দিকে চোখ তুলে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলল, আমি সত্যি জানি না কেন এমন ব্যবহার করলাম তোমার সঙ্গে। এই সিঁড়ি দিয়ে আমার পিছন পিছন উঠে এসে কত লোকই যে আবদার করে একটু বাজনা শোনাও। আমার প্রথম এবং একমাত্র বান্ধবী প্রিসিলার পর এই তুমিই এলে আমাকে কিছু শোনাতে। দিস ইজ আ গ্রেট ডে ফর মি, অমিত।

অমিত ওর লাজুক মুখ তুলে আস্তে আস্তে বলল, আমিও, লোবো মাস্টার, তোমার কাছে শুনতেই এসেছি।

একটা বিকট আর্তনাদ করে উঠেছিল লোবো, অ্যাঁ! তাতে রীতিমতো চমকে গিয়েছিল অমিত।

লোবোর আর্তনাদের দুটো কারণ ছিল। এক, এই ছোকরাও সেই অন্যদের মতোই হল শেষে! এরও উদ্দেশ্য কিছু প্রশংসা উগরে ফোকতায় পিয়ানো শুনে নেওয়া। আর দুই, এই প্রথম কেউ ওকে সম্মান করে মিস্টার লোবো না বলে লোবো মাস্টার বলল। বুকটা যেন কীরকম জুড়িয়ে এল ডাকটায়। যেমন আহ্লাদ হয় ভালো বাজনার পর কেউ যখন ওকে স্টাইল করে মায়েস্ত্রো' বলে। কিন্তু তার চেয়েও যেন এই লোবো মাস্টার ডাকটায়...।

লোবোর চিন্তা কেটে গেল অমিতের কথায়, আমি কিন্তু রেস্তরাঁর ওইসব বাজনাই এখানে শুনতে আসিনি। ও তো হোটেল রেস্তরাঁয় গেলেই শোনা যায়।

লোবো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তা হলে কী শুনবে?

অমিত বলল, এইসব। বলে রেকর্ডগুলো এগিয়ে দিতে দিতে বলল, দিজ আর অল গ্রেট পিয়ানো পিসেজ। আমি তোমার হাতে শুনতে চাই।

আমার হাতে! দ্বিতীয়বারের মতো আর্তনাদ করে উঠল লোবো।

মুখে একটা সরু মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে অমিত বলল, ইয়েস, মাস্টার লোবো।

এবার বেপরোয়া হয়ে পড়েছে লোবো—তুমি কী করে ভাবছ আমি ও সব বাজাতে পারব? আমি জীবনে ক্ল্যাসিকাল বাজিয়েছি?

আর তখনই, ঠিক তখনই, অমিত ওই কথাটা বলেছিল যা আজও লোবোকে তাড়া করে ফেরে। বলেছিল, দ্য ক্ল্যাসিক ইজ ইন দ্য মাইণ্ড। সব ক্ল্যাসিকই মগজে ভর করে থাকে। তাকে ধরার জন্য চাই কন্ঠ, মুখ বা আঙুল। সেরা পিয়ানোর জন্য চাই সেরা আঙুল, অ্যাণ্ড ইউ হ্যাভ ম্যাজিক ফিঙ্গার্স, মাস্টার।

—কিন্তু আমার মাথায় যে কিছু নেই অমিত! ফের আর্তনাদ করে উঠল লোবো।

অমিত বলল, সেজন্যই তো এইগুলো তোমায় শোনাব।

লোবো এবার রীতিমতো বিরক্ত—শুনে শুনে ও সব বাজানো যায়? ওগুলো কি 'কে সেরা কেরা' না 'হামটি ডামটি'?

ক্ল্যাসিকাল পিস-এর কয়েকটা স্টাফ নোটেশন বই সামনে মেলে ধরে অমিত বলল, এর থেকে।

—আমি নোটেশন পড়তে জানি না।

–আমি তোমায় শিখিয়ে দেব।

–তুমি!

প্রায় আকাশ থেকে ছিটকে মাটিতে পড়েছিল লোবো। তোতলাতে তোতলাতে শুধোল, তু...তু...মি স্টা...স্টাফ নোটেশন পড়তে জানো?

অতি করুণভাবে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ জীবনে শেখার মধ্যে ওইটাই শিখেছি, কলেজের পড়াশুনো আমার ভালো লাগে না।

-তা গাইতে, বাজাতে শেখোনি?

–না, আমার সব গান, সব বাজনা মাথার মধ্যে।

এই বলতে বলতে অমিত ওর পোলিয়োবিধ্বস্ত সরু ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল সামনে। এতক্ষণ রেকর্ড দেখানো, বই মেলেধরা সব কাজই ছেলেটা বাঁ-হাতে সেরেছে, সেগুলো বয়েও এনেছিল ও বাঁ-হাতে, বাঁ-বগলে চেপে। ডান হাতটার দিকে লোববার নজরই যায়নি।

লোবো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, অমিত, আমার বাড়িতে এই তোমার প্রথম আসা, কিন্তু শেষ আসা নয়। তোমার এই আসার সম্মানে আমি একটা ছোট্ট বাজনা বাজাতে চাই। তুমি ফরমানা করো।

অমিত বলল, ব্লু ড্যানিউব।

—রু ড্যানিউব? দ্যাটস মাই ফেভারিট ওয়ালজ!

—হয়তো পৃথিবীর সেরা ওয়ালজ পিসও, মাস্টার।

—কী করে জানলে আমি ওটা বাজাতে পারব?

—কারণ দু-মাস আগে এক সন্ধ্যায় ট্রিনকাসে তুমি এটা বাজিয়েছিলে। আমি দিদির সঙ্গে বসে সেই বাজনা শুনে বলেছিলাম, এর হাতে তো জাদু খেলে। হি ইজ টু প্রেশাস ফর হোটেলজ অ্যাণ্ড রেস্টোরান্টস। এর উচিত মোজার্ট, বেটোফেন বাজানো। তো দিদি বলল...

উৎকন্ঠার সঙ্গে ললাবো বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো দিদি কী বলল?

অমিত বলল, ও বলল ওরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। হালকা-পলকা জিনিসেই জীবন কাটিয়ে দেয়। ক্ল্যাসিকালচর্চার টেম্পারামেন্টই ওদের থাকে না।

মুখটা হঠাৎ ভার হয়ে গেল লোবোর। পিয়ানোর ঢাকনাটা তুলে কি-বোর্ডের উপর আলতো করে একটু আঙুল বুলিয়ে বলল, খুব ভুল বলেনি তোমার দিদি। তাঁর মৃত্যুর আগে মা-ও এই কথাটাই বলত দেখা হলে। বলত, বাজনা অনেক বাজিয়েছিস সনি, এবার আসল বাজনাটা ধর। আসল বাজনা বলতে মা বুঝতেন মোৎজার্ট, যার একটা পিস বাজিয়ে আমাকে ঘুম পাড়াত মা। এই পিয়ানোয়। মার নিজস্ব পিয়ানোয়। বলত, এ হল ছোট্ট একটু নৈশসংগীত।

অমিত বলল, আইনা ক্লাইনা নাখটমজিক। আ লিটল নাইটমিউজিক।

লোবো অবাক হয়ে বলল, তুমি জানো?

-কেন, তুমি জানো না?

খুব ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে লোবো বলল, মার বাজনার যেটুকু স্মৃতি, শুধু ওইটুকুই। খুব মনে হত একসময় রেকর্ড কিনে পুরোটা তুলে নিই, কিন্তু ভয় হয়েছে। ওতে ছেলেবেলার স্মৃতিটুকু আলগা হয়ে যাবে।

অমিত প্রতিবাদ করল, তা কেন, লোবো মাস্টার? মার স্মৃতিতে একটা প্রার্থনার মতোও তো হতে পারত বাজনাটা।

জড়তা ভেঙে কোনো মতে লোবো বলল, তুমি বলছ?

তারপর পিছন ফিরে অমিতের দিকে না তাকিয়ে আপনমনে লোবো ধরে বসল ‘ব্লু ড্যানিউব’-এর সুর নয়, আনন্দ-ফুর্তির নীল স্বর্ণিল-স্বপ্নিল সুর ‘আইনা ক্লাইনা নাখটজিক।

স্বল্পক্ষণের বাজনাটা শুনে অমিত বলল, এই অসাধারণ বাজনাটা কিন্তু পিয়ানোর বাজনা নয়। ইটস অ্যা আনফরগেটেবল অর্কেস্ট্রাল পিস প্লেড অনবদ্য ভায়োলিন। তুমি পিয়ানোয় যেটা বাজাও তা হল পিসটার মূল সুর। বলতে হয়, জাস্ট দ্য থিম টিউন। বাট দেন ইট ওয়জ মার্ভেলাস। সুরটা শুনলেই মন ভালো হয়ে যায়।

আজ সকালে ট্রিনকাসের ছেলেগুলো যখন সিঁড়ির তৃতীয় বাঁকে দাঁড়িয়ে অত কথা বলছিল হয়তো লোবোর মধ্যে একটু করে শত বছর আগের সেই রাতটা ফুটে উঠছিল যেদিন অমিত ওর পিছু নিয়ে ঠিকই বাঁক অবধি উঠে এসেছিল।

অথচ, হায় কপাল, সেই দৃশ্যটারই কোনো স্মৃতি নেই লোাবোর। কারণ মদে ভারাক্রান্ত ছেলেটিকে সে দেখলই না। কথায় বলে দেবদূতেরা খুব নম্র চরণে যাতায়াত করে। তাদের যাওয়া আর আসা সবই খুব নীরব।

ন-মাস আগে অমিতের চলে যাওয়াটাও চিঠির পাতা ওড়ার মতোই খুব নিঃশব্দে ঘটল। বসন্তের সোনালি সকালে একটা হালকা ইনল্যাণ্ড খামে করে এসেছিল খবরটা, অমিতের নিজের হাতে লেখা :

মাস্টার, এই চিঠি শুধু তোমাকেই লেখা যায়। কারণ তুমি সব দুঃখকেই সুরে ব্যক্ত করতে চাও, যা আমারও খুব মনঃপুত। এই যে আমি রেকর্ডে মোজার্টের মৃত্যুগীত ‘রিকুইয়ম’ শুনছি আর চিঠি লিখছি শেষবারের মতো এর আনন্দ পৃথিবীর আর কাউকে বোঝাতে পারব না। বিশেষ করে এই দিল্লি শহরের

অপোগন্ডদের, যারা ভাবতেই পারে না মানুষ কত বড়ো আনন্দের সঙ্গে দুঃখ জয় করতে পারে। এই শহরে দিদির সুইসাইডের পর থেকেই ভাবছিলাম একটা কথা : দুঃখ জয় কাকে বলে? দুঃখকে অন্য দশ ভাবনার চাপে দূর করা, না এত বেশি আনন্দ উপলব্ধি করা যায় তোড়ে দুঃখের আর লেশমাত্র থাকে না চিত্তে।

আমি দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিলাম। বিরাট আনন্দের সন্ধানে দুটি জিনিসের মধ্যে এসে পড়েছি আমি—সংগীত আর মৃত্যু। আমি দু-টিকেই গ্রহণ করেছি। ভাবতে পারো, এই চিঠি ডাকে ফেলে এসে যখন হুইস্কি আর ঘুমের বড়িগোলা জল পান করব তখন আমার কানের কাছে রেকর্ডে বেজে চলবে মোজার্টের রিকুইয়ম'? পৃথিবীর আর কেউ বুঝুক, না বুঝুক তুমি নিশ্চয়ই জানবে কী সুখে আমি চলে গেলাম। আশা করব আমাদের বন্ধুত্বের স্মরণে একটু ছোট্ট রাত্রিসংগীত বাজিয়ে নেবে।

চিঠিটা পড়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মুড়ে ভাঁজ করে রাখা হয়নি। চিঠিটা হাওয়ায় উড়ে মাটিতে পড়ল, লোবোর আঙুলের গাঁটগুলোয় তখন অসহ্য যন্ত্রণা। বাতের অ্যাটাকের মতো। ও অনেকক্ষণ আঙুল মটকাল, পরে গরম জলে হাত ডুবিয়ে বসল। সেদিন আর হোটেলে বাজাতে যাওয়া হল না। রাতে পিয়ানোয় বসে মনে হল কবজি থেকে আঙুল অবধি হাতের কোনো সাড় নেই। চোখ দুটো ক্রমশ ভিজে আসছে, স্কোরশিট পড়া দুষ্কর। একটু একটু করে ভয় জাগল—এরপর স্টাফ নোটেশন পড়া ভুলে যাব না তো?

লোবো পিয়ানো থেকে উঠে বাইরে সিঁড়িতে বসে তার দিকে চেয়ে রইল। মনে পড়ল বাবার মৃত্যু, প্রিসিলার চলে যাওয়া, ইস্কুলের মাস্টারের মতো অমিতের ওকে স্কোর পড়া শেখানো। মনে পড়ল বৃদ্ধাশ্রমে মৃত্যুশয্যায় মার কথা—সনি, আসল বাজনা বাজাতে শেখো।

ওই সিঁড়িতে শোয়া অবস্থায়—লোবোর মনে পড়ে না সিঁড়ির তৃতীয় বাঁকে না শেষ ধাপিতে—ওর হার্ট অ্যাটাকটা হয়। পরে হাসপাতালে ডাক্তারের মুখে শুনেছিল সকালে হাতের যন্ত্রণাটা অ্যাটাকের পূর্বাভাস ছিল হয়তো।

কিন্তু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেও সনি লোবো যে হোটেলে ব্যাণ্ডে ফিরল না এটাতেই সবাই খুব অবাক হয়ে গেল। লোকটার হাতটাও কি গেল তা হলে? নাকি মগজটা ধসল? মদ আর গাঁজার কম্বিনেশন তো অনেক দিনের। কেউ কিন্তু একবারটি ভাবল না মানুষটার হৃদয় নিয়ে। নাকি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের হৃদয় হয় না?

সনি লোবো কি-বোর্ডে হাত বুলোতে বুলোতে নিজের আঙুলগুলোকেও দেখছিল। কতকাল ঘুমিয়ে আছে ওরা, যেন সাপের ঘুম। তবে সাপ নয় বলেই হয়তো শীতে জাগল, ভর শীতে, একেবারে ক্রিসমাস উইকে। লোবো একটু হালকা সুর ধরল, তারপর 'ডক্টর জিভাগো' ছবির টাইটেল মিউজিক, তারপর 'ব্লু ড্যানিউব। পাশের বাড়ির রেচেলদের ফ্ল্যাট থেকে ভেসে আসছে ক্রিসমাস ক্যারেলজ। লোববার বাসনা হল অমিতের উপহার দেওয়া শ্যমানের পিয়ানো 'ফান্টাজিয়া'-র স্টাফ নোটেশন দেখে পিসটা একবার বাজায়। তাই 'ব্লু। ড্যানিউব' শেষ করেও স্বরলিপির বইটা খুঁজতে উঠল, আর তখনই দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পেল।

বলতে নেই বেশ ভালো রকম বিরক্তই হল লোবো। সন্ধ্যেকালে আবার কী উৎপাত! ট্রিনকাসের সেই ছোকরাগুলোই আবার ফিরে এল না তো। নাকি পাড়ার ছোকরাদের চাঁদার আক্রমণ? ইদানীং হিন্দুদের পুজোর মতো খ্রিস্টানদের ক্রিসমাসে, নিউ ইয়ার্স ডে ইত্যাদিতে চাঁদা তোলা চালু হয়েছে। কিংবা, কে জানে, ডিকিই এল হয়তো বগলে রামের বোতল নিয়ে। সে-ক্ষেত্রে ওকেও আজ ফিরিয়ে দিতেই হবে; ন-মাস পর আজ ওর আঙুলগুলো পিয়ানোর

রিডের স্পর্শ চাইছে। এত পিপাসা যে জমতে পারে আঙুলের ডগায় তা ওর ধারণাতেও ছিল না। কি-বোর্ড আঙুলগুলো শুধু নেচে বেড়াচ্ছে না, ওরা রিড থেকে যেন সুর পান করছে। সুরগুলো যেন সুরা হয়েছে আজ আঙুলের ঠোঁটের ডগায়।

'আঙুলের ঠোঁটের ডগা!' কথাটা মনে হতেই একটা সরু হাসি ফুটল লোহোর মুখে। অদ্ভুত অদ্ভুত পরিস্থিতিতে মানুষের কল্পনায় কত কীই যে ঘটে! লোবো মুখের সেই হাসির ঝিলিক নিয়েই ফ্ল্যাটের দরজাটা আস্তে করে খুলল।

খোলার সঙ্গে সঙ্গে একরাশ হিমেল হাওয়ায় ঘর ভরে গেল। হালকা একটা সোয়েটার গায়ে লোবোর, তাতে ওই ঠাণ্ডা রোখা মুশকিল। ও দরজা খুলেই ঠাণ্ডার প্রতিক্রিয়ায় এক পা পিছিয়ে এল। কিন্তু ততক্ষণে ওর চোখ পড়ছে দরজার বাইরে দাঁড়ানো আগন্তুকের উপর। আর তৎক্ষণাৎ গায়ের শীতভাবটা যেন বুকের ভিতরে ঢুকে এল। ফুসফুঁসে নয়, সরাসরি হৃদয়ে শীত বসা যেন। লোবো কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল, ও হেসে কিছু বলবে, না শীতে আরও কুঁকড়ে যাবে বুঝতে পারল না। বস্তুত, ও হাসলও না, কুঁকড়ে মূক হয়েও গেল না। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে দাঁড়িয়েই বিস্ফারিত নেত্রে আগন্তুককে দেখতে দেখতে শুধু বলল, তুমি!!!

ক্রিসমাস উইকের এক রাত, হিমেল হাওয়ার রাত, বাইরে মধ্যরাত্রি নীল আকাশ, দূরে কিছু কিছু বাড়ির জানলায় আলো জ্বলছে জোনাকির মতো, বাড়ির সামনের বটগাছটা অন্ধকারে ভূতের মতো ডালপালা ছড়িয়ে রাস্তা পাহারা দিচ্ছে, আশপাশের বাড়ি থেকে ক্রিসমাস ক্যারলজ ভেসে আসছে, ভেসে আসছে রাস্তার রোয়াক থেকে বাঙালি খ্রিস্টান ছোকরাদের মাতাল গান, আর দরজার ফ্রেমে ছবির মতো ধরা এক নারীমূর্তি।

২.

প্রিসিলা!

জানো প্রিসিলা, এই যে তুমি অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে আছ আমার ছোট্ট খাটে, এভাবে আগে তুমি কখনো ঘুমোওনি আমার বিছানায়। সত্যি বলতে কি, তুমি আগে কখনো শোওইনি আমার বিছানায়। শুধু একবার ছাড়া। সেই শোওয়াটা কী যথার্থ শোওয়া? ...না। ও কথা আমি এখন ভাবতেও চাই না। পরে যদি মনে পড়ে তোমাকে মনে করার...

হ্যাঁ, প্রিসিলা, তুমি সেই প্রিসিলাই আছ। তোমাকে অন্য কেউ বলে ভুল করতে পারব না।

না প্রিসিলা, তুমি কিন্তু সেই প্রিসিলা নেই। তোমাকে সেই প্রিসিলা বলে ভুল করতেও পারছি না।

কী অদ্ভুত সমস্যা বলো দিকিনি। একই সঙ্গেই তুমি প্রিসিলা প্রিসিলা নও। একই সঙ্গেই তুমি আছ এবং তুমি নেই। তুমি ক্লান্ত দেহে গভীর ঘুমে মগ্ন আছ, আর আমি তোমায় অক্লান্তভাবে দেখছি। এত কাছে তুমি, তবু তোমাকে আমি স্পর্শ করছি না। তোমার ওই পরিচিত লাল ঠোঁটে চুমে রাখছি না। কারণ আমি এই মুহূর্তে ভাবছি তুমি প্রিসিলা, তার পরমুহূর্তে ভাবছি তুমি সে নও। শুধু যখন তুমি অনুরোধ করলে তোমাকে একটা ঘুমপাড়ানি সুর-লালাবায়— শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই তখনই তীব্রভাবে মনে হয়েছিল তুমি আমার সেই পুরাতন প্রেম। ইচ্ছে করছিল তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, কপালে চুমো দিয়ে আমার এই বিছানায় শুইয়ে দিই। তাঁকে বৃদ্ধাশ্রমে ছেড়ে আসার আগে যেমনটি দিতাম মাকে।

কিন্তু এসব যখন ভাবছি তখন কী দেখলাম? দেখলাম তুমি আমার অফার করা রাম দিয়ে পটপট দুটো ঘুমের ওষুধ গিলে ফেললে। আর অমনি তুমি প্রিসিলা থেকে সম্পূর্ণ অচেনা কেউ একটা হয়ে গেল। যে-কেউ ঘুমের বড়ি খাচ্ছে এ আমি স্বপ্নেও আনতে পারি না। আমি ভেবে উঠতেই পারছি না তোমার এত ঘুমের দরকার হল কেন? তুমি কত দিন, কত মাস, কত বছর ঘুমোওনি প্রিসিলা? এই আমি তোমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে তোমাকে দেখছি, যেন তুমি গানের স্বরলিপি। কত সুর তোমার মধ্যে আহা! আবার কত কত সুর মরেও গেছে, ইস।

তুমি ঘুমোও প্রিসিলা, আর আমি তোমায় দেখি। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই তোমাকে চিনে উঠতে পারব কি না। নাকি মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে অন্য মানুষ হয়ে যায়!

আমি এখনও ভুলতে পারি না বিদায় দিনে দেখা সেই তোমাকে। একটা আকাশি নীল ফ্রক ছিল তোমার পরনে। হালকা করে কাঁধের এক পাশে ফেলা ছিল একটা গাঢ় নীল স্কার্ফ; আর তোমার পায়ে ছিল সাদা হাইহিল জুতো। সেদিনই প্রথম তোমাকে লাল বা উজ্জ্বল গোলাপির বদলে ফ্রস্টেড পিঙ্ক লিপস্টিক ব্যবহার করতে দেখেছিলাম। যখন আমার পিয়ানোর গায়ে হেলান দিলে তুমি আমায় চুমু দিয়ে, আমি অবাক চোখে তোমার ঠোঁটের ওই হিমশীতল রংটাই দেখছিলাম। তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি তোমার ঠোঁটের ওই হিমশৈত্য একদিন আমাদের সম্পর্কেও ঢুকে পড়বে। পরে আমার ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় বাঁকটায় দাঁড়িয়ে তুমি যখন হাত নাড়ছিলে ক্রমাগত আমি তোমাকে সব চেয়ে বেশি চাইছিলাম, ভালোবাসছিলাম ভেতরে ভেতরে। শুধু একটা ক্যামেরার অভাবে দৃশ্যটা ধরে রাখতে পারিনি সেদিন।

আর আজ তুমি আমার সামনে, এইখানে, এত কাছে শুয়ে, অথচ আমার ভিতরটা কীরকম ফাঁকা ফাঁকা। এ তোমার কী কালঘুম প্রিসিলা, যে তোমাকে ডেকে তুলতেও সাহস হবে না আমার? এই মদ আর ঘুমের বড়ি মেশানো ঘুমকে বড্ড ভয় পাই জানো, প্রিসিলা? অমিত যখন ওর শেষ চিঠি লিখছিল আমাকে, ও হুইস্কির সঙ্গে ঘুমের বড়ি মেশাচ্ছিল। ও হো, তুমি তো অমিতকে চেনোই না, ও আমার জীবনে এসেছিল তুমি চলে যাওয়ার পর। জানি তুমি কষ্ট পাবে তবু আজ আমি সত্যি কথাটাই বলব—অমিতকে পেয়ে আমি তোমাকে ভুলেই গিয়েছিলাম।

না, না, না। তুমি যা ভাবছ, তা না। অমিত ওয়জনট গে। আমাদের কোনো সমকামিতা ছিল না। তবু আমরা একে অন্যের উপর নির্ভর করতাম স্বামী-স্ত্রীর মতো। অমিতের ডান হাতটা পোলিয়োয় নষ্ট ছিল, তাই আমার দুটো হাত ছিল ওর হাত। আর আমার সাদামাটা মগজের মধ্যে ও একটু একটু করে সংগীতের রহস্য ঢোকাচ্ছিল। পরে আমি যখন ওর রেকর্ড শুনে, ওর সাহায্যে নোটেশন পড়ে ক্লোদ দেবুসির রচনা ক্ল্যারিনেট ও পিয়ানোর জন্য ‘র‍্যাপসোডি’-র পিয়ানো-অংশ বাজিয়েছি ও আনন্দে এতই দিশেহারা হয়ে গেছে যেন ও নিজের হাতে বাজনাটা বাজাল। দেখতে দেখতে একটা সময়ও এসেছিল যখন আমি কী বাজাচ্ছি ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাকে দিয়ে কী বাজিয়ে নিতে চায়। আমি একদিন অভিমান করে বলেওছিলাম ওকে, তুমি আমার আঙুলগুলোকে ম্যাজিক ফিঙ্গার্স বলল ঠিকই, কিন্তু এরা আসলে তোমার মগজের দাস। দ্য প্লে দ্য টিউনজ ইউ ওয়ান্ট দেম টু প্লে।

কিন্তু এই দাসত্বই আমি চেয়েছিলাম, প্রিসিলা। হাত-পা-চোখ-নাক-কান সবই তো মগজের দাস, নয় কি? অমিত ছিল আমার মগজ, এবং আস্তে আস্তে হয়ে উঠছিল আমার মন ও হৃদয়। আর এইখানেই যত গোল বাঁধল শেষে। কিন্তু

সেকথা থাক। সে অনেক পরের কথা। তোমাকে দেখতে দেখতে ফের একটু তোমার কথাই বলি বরং...

তুমি ঘুমিয়ে পড়ার আগে বলছিলে বম্বে তোমাকে সব কিছু দিয়ে সবই ফের কেড়ে নিয়েছে। চোদ্দো বছর পর তুমি ফিরে এসেছ, প্রিসিলা, একটা বিধ্বস্ত বারবনিতার চেহারা নিয়ে। প্লিজ ডোন্ট মাইণ্ড মাই ল্যাঙ্গোয়েজ, বাট দ্যাট ইজ হাও আই ফিল অ্যাট দিস মোমেন্ট। এই ক্রিসমাস উইকের গভীর রাতে। বম্বে থেকে যেন এক শুষ্ক, বিবর্ণ উপহারই হাওয়া হয়ে বয়ে এল ক্রিসমাসের সপ্তাহে। তবু...তবু প্রিসিলা আমি তোমাকে দু-হাত ভরে নিতে চাই কারণ কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়ে অমিত আমাকে একটা শিক্ষা দিয়ে গেছে—যে, শেষবিচারে সংগীতের চেয়েও বড়ো সম্পদ মানুষ। যদিও ওর মৃত্যুর দিনের চিঠিতে কেন শুধু সংগীত আর মৃত্যুর কথা বলল আমি জানি না। ...কিন্তু আমি ফের কেন অমিতের প্রসঙ্গে যাচ্ছি? ওর বিষয়ে তুমি তো প্রায় কিছুই জানো না। কিন্তু তোমাকে শুনতে হবে ওর কথা। তার আগে আমি শুধু তোমার কথা বলব।...

কিন্তু কী বলব?

বম্বে থেকে লেখা সেই ভয়ংকর চিঠিটার পর তুমি আরও কুড়িটা চিঠি লিখেছিলে, যার কোনোটাই আমি খুলে পড়িনি। কী লিখতে সেসব চিঠিতে তুমি? ভালোবাসার কথা? অনুরাগের কথা? বম্বের সিনসিনারি? ওখানকার বন্ধুবান্ধব, প্রেমিকদের কথা? একবার কাগজ পড়েছিলাম তোমাদের একটা দল লণ্ডনে গিয়ে কনসার্ট করেছে। ওখানকার কাগজে লিখেছে তোমার কণ্ঠ নাকি ডিভাইন, ঐশী। প্রিন্সেসের ব্যাণ্ডের বন্ধুরা তা নিয়ে একটু টীকাটিপ্পনীও কেটেছিল আমার বুকে জ্বালা ধরানোর জন্য। কেউ বললে তোমার গলা কনি ফ্রান্সিসের মতো, কেউ বললে ন্যান্সি সিনাট্রার মতো, আবার কেউ বললে

তোমার পাশে কলকাতার রেস্টোরান্ট গায়িকাদের কোকিলের পাশে কাক মনে হয়। আমি নীরবে হেসে পিয়ানো বাজিয়ে গেছি, আমার বুকে তখন কোনো আঁচড়ই কাটে না এই সব কথা। একটাই টান তখন আমার—কখন বাড়ি ফিরে অমিতের শেখানো স্টাফ নোটেশন লেসনগুলো নিয়ে বসব। তখন যে আমি আবিষ্কার করেছি ছাপার হরফে নিদ্রিতত সুরকে জাগিয়ে তোলার খেলা।

তোমার চিঠিগুলো কিন্তু আমি ফেলেও দিইনি প্রিসিলা। কেবল সেই প্রথম ভয়ংকর চিঠিটা ছাড়া; কিন্তু সেটা তো আমার পড়াই হয়ে গিয়েছিল। বাকি সব চিঠি পরিপাটি করে সাজানো ছিল দেরাজে। একদিন সেখান থেকেই একটা চিঠি বার করে পড়েছিল অমিত, আমি ট্রিনকাস থেকে ফিরতে জিজ্ঞেস করল, প্রিসিলা কে?

আমি কোনোমতে রাগ সংরবণ করে যথাসম্ভব শান্ত গলায় বললাম, তুমি আমার চিঠি পড়েছ?

ও প্রথমে খুব থতমতো খেয়ে গেল, তারপর বেশ বিব্রত স্বরে বলল, লোবো মাস্টার, সংগীত কি শুধু শরীর, যন্ত্র আর বই দিয়ে হয়?

আমি ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলাম, তার জন্য অন্যের চিঠি পড়তে হয় বুঝি? ও তখন বলল, আমি লোবো মাস্টারের মনের হদিশ করছিলাম।

আবার দেখতে পাচ্ছ প্রিসিলা, অমিত কীভাবে মিশে যাচ্ছে আমার সব কথাবার্তা, কল্পনা, ভাবনায়? আমি তোমার কথা বলব ভাবছি, আর ও চলে আসছে। ও-ই আমাকে শুনিয়েছিল মোজার্টের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা, বেটোফেনের বধির হয়ে যাওয়ার কথা, সুমানের উন্মাদ অবস্থায় রাইন

নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার কথা, তারপর নদী থেকে উদ্ধার পেয়ে জীবনের শেষ আড়াইটা বছর পাগলা গারদে কাটানোর কথা। আমি যখন স্নমানের জীবনের ট্র্যাজেডির কথা ভেবে মুষড়ে আছি, ও বললে, এখনই সময় ওঁর পিয়ানো কনচের্ত নিয়ে বসার। বলে খুলে বসল ১৮৪৭-এ গড়া মানের ডি মাইনরের পিয়ানো ট্রায়ো।

আমি তখন প্রশ্ন তুলতাম, একটা পিয়ানোয় কী করে ট্রায়ো হবে? ট্রায়োতে তো তিনটে পিয়ানো চাই।

অমিত বলত, সেজন্য তো আমার রেকর্ডই আছে। আমি শুধু দেখতে চাই লোবো মাস্টারের হাতে এসব জিনিস কী দাঁড়ায়।

তুমি ভাবতে পারছ প্রিসিলা, কী এক ভীষণ নির্জন খেলায় আমরা গোপনে মেতেছিলাম দু-জন? আমি ক্ল্যাসিকাল পিস শিখছি কোনো আসরে বাজাব বলে নয়, শুধু আমি আর

অমিত নির্জন কিছু সুর আবিষ্কার করব বলে। ও যেমন একদিন বলল, তুমি পিয়ানোয় আইনা ক্লাইনা'-র সুর তোল কেন? ওটা তো পিয়ানো পিস নয়।

আমি বললাম, মা আমায় ওভাবেই শুনিয়েছে বলে।

অমিত উল্লাসে ফেটে পড়ে বলল, দ্যাটস দ্য পয়েন্ট! মার পিয়ানোর তুলে দেওয়া সুরটাই তোমার কাছে 'আইনা ক্লাইনা', ইউ প্লে ইট অ্যাজ ইফ ইট ওয়জ মেজ ফর দ্য পিয়ানো। 'আইনা ক্লাইনা' বাস্তবিকই তোমার জীবনে রাত্রিসংগীত, কারণ তোমার মা তোমাকে বিছানায় শুইয়ে ওই সেরিনাড বা

প্রেমগীতিটি বাজাতেন। ওই নিপুণ, নিখুঁত প্রেমের সুরটা তাই তোমার কাছে লালাবায় বা ঘুমপাড়ানি গানও। নয় কি?

আমি অগত্যা বলতে বাধ্য হলাম, হ্যাঁ।

অমিত তখন বলল, আমি তোমার চিঠি পড়ছিলাম তোমার মনের প্রেমের সুরটা জানার জন্য। এনি প্রবলেম?

আমি বলেছিলাম, তার জন্য চিঠি পড়ার দরকার নেই। আমি তোমায় শুনিয়ে দিচ্ছি... বলে ধরে ফেলেছিলাম ডরিস ডে-র গানটা।—কে সেরা সেরা, হোয়াটএভার উইল বি উইল বি, দ্য ফিউচার নট আ ওয়ার্স টু সি হোয়াট উইল বি, উইল বি।

জানো প্রিসিলা, এই গানটা আমি তোমার চেয়ে ভালো কাউকে গাইতে শুনিনি। আমার মনে পড়ে প্রিন্সেসের সেই সন্ধ্যেটা যেদিন প্রথম তুমি গাইলে গানটা। আমার মনে হল তুমি অন্য কারও গান গাইছ না। তোমার নিজের জীবনের কথা শোনাচ্ছ। ক্ষণিকের জন্য মনেও হয়েছিল বুঝি-বা তোমার চোখের কোণে একবিন্দু জল দেখলাম। ব্যাণ্ডের শিফট শেষ হতে তোমাকে গিয়ে যখন গানটার প্রশংসা করলাম তুমি আমায় কী বলেছিলে, মনে আছে? বলেছিলে দিনটা তোমার জীবনের এক অন্ধকার দিন। কেননা তার আগের রাতে তোমার ছেলেবেলার বয়ফ্রেণ্ড, তোমার ন-বছরের স্টেডি লাভার ক্লাইভ তোমায় ছেড়ে চলে গেছে। ও শুধু জানাতে এসেছিল যে ইভন বলে একটা অন্য মেয়ের সঙ্গে ও জীবন গড়তে চায়। তুমি ওকে ওর দেওয়া পান্নার আংটিটা ফেরত দিয়ে বলেছিলে, গুড লাক! তারপর মাঝরাতে ব্লেড দিয়ে নিজের হাত কেটে ফালা ফালা করেছিলে।

তুমি কালো গাউনের লম্বা হাতা সরিয়ে সেই সব কাটা-ছেড়া আমায় দেখালে। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার ফাঁকে ফাঁকে চাপাস্বরে গাইলে কে সেরা সেরা। আর ঠিক তখন, সেই মুহূর্তে আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেলাম। ভুলে গেলাম তোমার সঙ্গে আমার বয়সের বেশ বড়োসড়ো ফারাক। ভুলে গেলাম আমার জীবনের প্রতিজ্ঞা যে কখনো বিয়ে করব না। সেক্স ইজ ফাইন, একটা দুটো লম্বা সম্পর্কও ঠিক আছে, কিন্তু প্রেম, বিবাহ...ওহ, নো! আই কান্ট হ্যাণ্ডল দ্যাট।

আমি তোমার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে কী বলেছিলাম মনে আছে? বলেছিলাম, আগামী অফ ডে-টা আমার সঙ্গে কাটাবে, প্রিসিলা? তুমি বললে, কাটাব; কিন্তু কোনো হোটেল, রেস্তরাঁ বা সিনেমা হলে নয়।

আমি ভিতরে ভিতরে সিঁটিয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, মেয়েটা বলে কী! আমার মতো লোকের জীবনে হোটেল, রেস্তরাঁ, সিনেমার বাইরে আছেটা কী? আর আছে নিজের ফ্ল্যাটটুকু। প্রথম দিনই ফ্ল্যাটে আসার কথা বললে ভাববে বিছানায় নেওয়ার ধান্ধা করছি। আমি হোটেলের নির্জন লবিতে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কত কী আকাশ-পাতাল ভাবলাম। শেষে কী মনে করে দুম করে বলে দিলাম, নো নো, ডোন্ট ওরি, আমি তোমাকে একটা অভিনব অভিজ্ঞতা উপহার দেব তোমায় অফ ডে-তে।

কী ছিল সেই অভিজ্ঞতা, তোমার মনে পড়ে? আমি তোমাকে ঝিরঝিরে বৃষ্টির বিকেলে নিয়ে গিয়েছিলাম সার্কুলার রোডে ওল্ড পিপল হোমে মার কাছে। আমার হাতে কেক, পেস্ট্রি, বিস্কুট আর ওষুধ ছিল মার জন্য। আমি বলেছিলাম তোমাকে সেগুলো তুলে দিতে ওঁর হাতে। আর মনে আছে উনি কী বলেছিলেন বিদায়মুহূর্তে? আমার হাতটা ওঁর হাতে চেপে ধরে বললেন, সনি, তোর জীবনে দুটো অপূর্ব জিনিস আছে, সামলে-সুমলে রাখিস। জিজ্ঞেস

করলাম, কী আছে আমার জীবনে মা? মা একবার তোমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই মেয়েটি। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, আর তোর পিয়ানো।

আমি পরিস্থিতির সামাল দেওয়ার জন্য বললাম, এই মেয়েটি আমার নয়, মা। সবে পরিচয়টা একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছে। আর পিয়ানোটাও আমার নয় মা। ওটা তোমার।

তখন ওই বারান্দার ইজিচেয়ারে আরও এলিয়ে গিয়ে মেঘলা আকাশ দেখতে দেখতে মা বললেন, কে আর সব কিছু নিয়ে জন্মায়? একটু একটু করে নিজের করে নিতে হয়?

সে-দিন বৃদ্ধাশ্রম থেকে বেরিয়ে প্রথম কথা বলেছিলে তুমি। কিছু বলার জন্য নয়, একটা কথা জানার জন্য প্রশ্ন করলে—কেন তুমি মাকে বললে আমি তোমার নই?

সত্যি বলছি। সে-দিন এ প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না আমার কাছে। আমি অবাক হয়ে তোমার দিকে চেয়েছিলাম। তুমি বললে, সনি, আমি বাড়ি যাব। আমি তোমাকে তোমাদের রয়েড স্ট্রিটের বাড়িতে পৌঁছে দিলাম। ফ্ল্যাটের দরজার মুখে তুমি আমার হাত চেপে ধরলে। কী উষ্ণ স্পর্শ সেটা, হাত যেন পুড়ে যাচ্ছে। আমি তোমার ঠোঁটে চুম্বন করলাম, অমন সুন্দর চুম্বন আমি কাউকে করিনি আগে। কারণ তার আগে তো কাউকে হৃদয় দিইনি। প্রথম যৌবনের নেশায় একে-তাকে হাবিজাবি চুমু সব। কিন্তু এই চুম্বন?

ঠোঁট থেকে ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে তুমি কাঁদো কাঁদো স্বরে বললে, বড্ড একলা লাগছে, সনি। আজ থেকে যাও।

আমি থাকার জন্যই তোমার সঙ্গে ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। কিন্তু থাকা হল না। তোমার ছোটোভাই ক্লেটন দেখা গেল তোমার বিছানায় শুয়ে। সঙ্গে একটা তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে। দে ওয়্যার মেকিং লাভ!

তোমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। তুমি তোমার পায়ের হাই হিল জুতোর একপাটি হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে ভাইয়ের উপর। বৃষ্টির মতো ঝরছিল তোমার জুতোর বাড়ি ওর সারা শরীরে। ক্লেটনকে বাঁচাতে গিয়ে আমিও পাঁচ-সাত ঘা জুতোর বাড়ি খেলাম। ওর সঙ্গিনীটি তখন নগ্নতা ঢাকতে বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। আর তুমি তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছ উন্মাদিনীর মতো, যোলো বছর বয়সে তোমার মেয়ের প্রয়োজন, স্কাউন্ড্রেল! তোমাকে পড়াশুনো শিখিয়ে মানুষ করব বলে আমি পড়াশুনো ছেড়ে হোটেলে হোটেলে গেয়ে বেড়াচ্ছি; অ্যাণ্ড দিস ইজ হোয়াট আই গেট ইন রিটার্ন! এই তার পুরস্কার।

মাত্র কয়েক ঘণ্টায় দু-জনে জগৎ দুটোকে কী সুন্দর চিনে গেলাম। বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে ফিরতে ঠিকই করে ফেললাম তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেব। এক নির্ভার আনন্দ আমায় ঘিরে ধরছিল সেদিন। গভীর রাতে পিয়ানো বাজিয়ে একটা গান ধরলাম জানো। জানো তুমি জানো, কারণ তোমায় এ-কথা আগে বলিনি তা হতে পারে না। নিজের মনের কোন কথাটা সে-সময় বলিনি তোমায় বলতে পারো?

পিয়ানো বাজিয়ে গাইলাম ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রার একটা করুণ, রোমান্টিক গান ‘স্ট্রেঞ্জার্স ইন দ্য নাইট, টু লোনলি পিপল’। করুণ গান, কিন্তু গাইতে গাইতে মন ভালো হচ্ছিল। হাতের কাছে রামের গেলাস রেখেছিলাম। কিন্তু এক সিপও খাওয়ার টান বোধ করলাম না। মাঝরাত্তিরে আমার কাজের মেয়েটা

ঘুম থেকে জেগে আমায় ধমকে দিল, সাব, ইতনা রাত তক নেহি সোওগে তো কাল কামপে যাওগে ক্যায়সে!

আমি পিয়ানো ছেড়ে উঠতে উঠতে ওকে গেয়ে শুনিয়ে দিলাম, কে সেরা সেরা, হোয়টএভার উইল বি...

শেষ অব্দি আমাদের বিয়েটা কেন হল না বলো তো প্রিসিলা? একেক সময় মনে হয় আমরা এত বেশি জড়িয়ে পড়েছিলাম যে, বিয়েটাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। তোমার অবশ্য অন্য কারণ ছিল; তুমি বলতে তোমার বাবা-মা-র চোখে আমি একেবারেই ভালো পাত্র নই। ওঁদের ধারণা ছিল আমায় বিয়ে করলে তোমার বাকি জীবনও হোটেলে হোটেলে কেটে যাবে। মিশনারি স্কুলের রিটায়ার্ড টিচার মিস্টার জোনাথান রোজ একবারও ভাবেননি সংগীত কত বড়ো বিদ্যা। তোমার মুখেই শুনেছিলাম তিনি আমাকে নিয়ে ঠাট্টার সুরে বলতেন, দ্যাট পিয়ানো উইজার্ড অব ইয়োর্স। তোমার ওই পিয়ানো জাদুকর।

তখন আমি মুখ বুজে সব সহ্য করেছি। কিন্তু আজ...আজ..., এই মুহূর্তে আমি জাদুকর। পিয়ানোর কি-বোর্ড আমার আঙুলের স্পর্শে তাদের সেরা সুর উগরে দেয়। পিয়ানোকে আমি প্রেয়সীর মতো উষ্ণ করে তুলতে পারি আদরে আদরে। আই ডোন্ট কেয়ার হোয়াট ইয়োর ড্যাডি বিলিভড, বাট...অমিতের মতো একজন মানুষ আমাকে জাদুকর বলে মেনে নিয়েছিল। শুনবে সেই দিনটার কথা যেদিন ওর কথায় আমার চোখে জল এল?

সেও এক শীতের দিন ছিল, আমি ট্রিনকাসের ব্যাণ্ডের সঙ্গে সে-সময়ের পপ হিটস সব বাজাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম দরজা ঠেলে রেস্তোরাঁয় ঢুকছে অমিত। এর আগে বহুবার বলা সত্ত্বেও ও ট্রিনকাসে আমার বাজনা শুনতে

আসেনি। ভালো ডিনারের লোভ দেখানো সত্ত্বেও। বললেই বলত, মাস্টার, তোমার মতো একটা লোক রেস্তোরাঁর ব্যাণ্ডে বাজাচ্ছে এ আমি চোখে দেখতে পারব না। ইউ বিলং ইন আ প্রপার ক্ল্যাসিকাল স্টেজ।

বলতে বাধা নেই আজ, এই অমিতই প্রথম শিখিয়েছিল আমাকে একটা ব্যাণ্ড আর একটা ক্ল্যাসিকাল অর্কেস্ট্রার মধ্যে তফাত। ওই প্রথম বোঝাল পিয়ানোর কী সুউচ্চ সম্মান আর গভীর গুরুত্ব পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গসংগীতে। বলেছিল, লোবো মাস্টার, তুমি কি জানো মোৎর্জাট, বেটোফেন, শোপ্যাঁ-রা কোন যন্ত্রে নিজেদের স্বপ্নে সুরগুলোকে প্রথম ধরতেন? তোমাকে আমি তোমার বাড়ির পিয়ানোতে পেতে চাই। তোমার ওই ফ্ল্যাটই তোমার ক্ল্যাসিকাল স্টেজ।

তো সে-দিন ওকে ট্রিনকাসে ঢুকে আসতে দেখে আমি বেশ অবাকই হয়েছিলাম। পরনে কালো স্যুট, নীল শার্টের কলারে লাল নেকটাই। অমিতকে বড় স্মার্ট আর চোখকাড়া লাগছিল। আমি বাজনা শেষ করে এসে বললাম, কী অমিত, আজ রাস্তা ভুল হয়েছে মনে হয়।

ও জিজ্ঞেস করল, তোমার ডিউটি শেষ হয়েছে মাস্টার? আমি 'হ্যাঁ বলতেই ও বলল, তা হলে চলো, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

শীতের অন্ধকারে পার্ক স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী কথা অমিত? ও বলল, আমার দিদির বিয়েতে কাল তোমাকে একজন সাক্ষী থাকতে হবে। আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, তার মানে?

–তার মানে আমার দিদির বিয়েতে তুমি উইটনেসে সই করছ।

আমার বিস্ময় তখনও কাটেনি। জিজ্ঞেস করলাম, দুনিয়ার এত লোক থাকতে একটা হিন্দু বিয়েতে খ্রিস্টান উইটনেস!

অমিত বলল, উইটনেসের আবার হিন্দু, খ্রিস্টান কী? বললাম, দ্যাখো অমিত, এ তো খুনখারাপি, ডাকাতির উইটনেস নয়। একটা পবিত্র, ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

ও বলল, সংগীতজ্ঞের আবার হিন্দু, খ্রিস্টান কী মাস্টার? তার উপর তুমি তো শুধু পবিত্র, ধর্মীয় নও, তুমি জিনিয়াস।

সত্যি প্রিসিলা, এর চেয়ে বড়ো সম্মান আমি পাইনি জীবনে। পথ চলতে চলতে কোনো মতে চোখের জল সামলাচ্ছিলাম। শেষে তাও পারলাম না, যখন অমিতেরও চোখে জল দেখলাম। উদবিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, অমিত, তোমার চোখে জল।

ও পোলিয়োয় শুকিয়ে যাওয়া হাতে চোখের জলটা মুছতে মুছতে বলল, দিদির বিয়েটা বাড়িতে কেউ মানতে পারছে না, জানো?

জিজ্ঞেস করলাম, কেন? ছেলে ভালো নয়?

–দারুণ ছেলে। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বড়ো অফিসার।

–তা হলে সমস্যাটা কোথায়?

–ছেলেটা খ্রিস্টান।

আমরা অনেকক্ষণ নিঃশব্দে হেঁটে পৌঁছে গিয়েছিলাম পার্ক স্ট্রিটের মুখে কবরখানাগুলোর কাছে। অন্ধকারে আরও নির্জন আর ভয়ংকর দেখাচ্ছিল

গোরস্থানটাকে। আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম, তা হলে তুমিই বা বিয়েতে অমত করছ না কেন? তোমরা বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবার।

কবরস্থানের অন্ধকার পটভূমিকায় ছোট্টখাট্ট অমিত একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, কারণ শর্মিলা ভালোবাসে অ্যান্ড্রুকে। এনি ফারদার কোয়েশ্চনজ?

আমি তড়িঘড়ি সংক্ষেপে বললাম, নো।

প্রিয় প্রিসিলা, এখন চাইলে তুমি কিছুটা অন্তত বুঝতে পারবে কেন আমি অমিতের কথাকে এত সম্মান দিই। দিই, কারণ আমার জীবনের সেরা সম্মানগুলো ও-ই আমার দিয়ে গেছে। ও আমাকে মাস্টার অ্যাখ্যা দিয়েছে, ও আমাকে সামান্য টিউন প্লেয়ার থেকে পিয়ানো পারফর্মার করছে। ও আমাকে জীবনের নিঃসঙ্গতম দিনগুলো সঙ্গদানে ভরিয়ে দিয়েছে...বড়ো কথা, ও আমাকে একটা পাতি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান থেকে বার করে বাইরের আলোকিত জগতে ছুড়ে দিয়েছে। তুমি জানো, মৃত্যুর আগের দিন মা কী বলেছিল আমাকে কারণ সেই সময় তুমি ছিলে আমার পাশে। হ্যাঁ, তোমাকে বিয়ে করার কথা বলেছিলেন। আর এও বলেছিলেন যে, রোজ সন্ধ্যায় আমি হোটেলে বসে যা বাজাই দ্যাটস সিম্পলি নট এনাফ।

মা-র প্রথম উপদেশটা কাজে আসেনি কারণ তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে। মা-র দ্বিতীয় নির্দেশটা আকস্মিকভাবে বাস্তব হল কারণ একদিন সন্ধ্যায় প্রচুর মদ্যপান করে টং হয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন আমার পিছু পিছু উঠে এল একটা অপরিচিত ছেলে, যাকে দেখে প্রথম প্রথম আমি বেশ বিরক্তিই হচ্ছিলাম।

হায়, হায়, হায়! ফের সেই বিরক্তির কথা। তোমার মনে পড়ে মা-র মৃত্যুর পর তোমাকে মা-র জীবনকথা শুনিয়েছিলাম? সেই বোধ হয় প্রথম বলি তোমাকে যে মা আমার জন্মদাত্রী মা নয়। অগাথা লোবো আমার সত্য। কিন্তু আমার জীবনের সব কিছু ভালোর জন্যই দায়ী একমাত্র ওই মা। আমার বাবার কাছ থেকে আমি মদ, সিগারেট এবং মহিলাসঙ্গে দীক্ষার বেশি কিছু পাইনি। মা শিখিয়েছিলেন পিয়ানো। আজ আমি যেটুকু যা সবই ওই পিয়ানোর জন্যে। কিন্তু তোমাকে কি বলিনি ছ-বছর বয়সে যখন আমার জন্মদাত্রী মা বাবার মদ এবং লাম্পট্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বাড়ি ছেড়ে একবস্ত্রে চলে গেলেন আর তার ক-মাস পর বাবা বিয়ে করে আনল অ্যান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ওম্যান উইথ লট অব ইংলিশ ব্লাড। আমি আলমারির মাথা থেকে লাফ মেরে ইচ্ছে করে পা ভেঙেছিলাম। হাসপাতালে চোখ মেলে দেখলাম মাথার কাছে বাবার সেকেণ্ড ওয়াইফ বসে। আমি চিৎকার করে বলে উঠেছিলাম, নার্স, এই ডাইনিটাকে আমার মাথার কাছ থেকে সরাও।

সেই বিরক্তি আমার বহুদিন কাটেনি। আমি বাবা ও ওর নতুন বউয়ের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাইওনি বহুদিন। তারপর একদিন এক বর্ষার দিনে বাইরে খেলতে যেতে পারিনি, নিরুপায় হয়ে কাচের শার্সিতে বৃষ্টির ঝাপটা দেখতে দেখতে প্রহর গুনছি কতক্ষণে বেরুনো যায়। হঠাৎ কানে এল বসার ঘর থেকে পিয়ানোর সুর। বাবার নতুন বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে এও এক নতুন উপসর্গ আমাদের বাড়িতে। একটা ইংলিশ আপরাইট পিয়ানো। আমি বসার ঘর দিয়ে যেতে-আসতে সবসময় আড়ে-ঠারে দেখেছি বস্তুটিকে কিন্তু কখনো ওটার ধারে গিয়ে দাঁড়াইনি। সবসময় মনে হয়েছে এই সৎমা আর ওর ওই পিয়ানোর জন্যই মা আজ আমাদের সংসারে নেই। বেশি করে মনে পড়ত সেই দুঃখের রাতটা যেদিন মা আমার হাত ধরে বেরিয়ে যাচ্ছিল বাড়ি থেকে। বাবা পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, নাথিং ডুইং। তুমি যেখানে খুশি যাও, আমার ছেলেকে নিতে পারবে না।

মা বলল, আমি তোমার মতো একটা মাতাল বদমাশের হাতে ছেলেকে রেখে যাব না।

বাবা আমাকে মার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, সেজন্য কোর্টে যাও। কিন্তু গায়ের জোরে এ বাড়ি থেকে তুমি ওকে বার করতে পারবে না।

আমি গলা ছেড়ে কাঁদছিলাম। বাবা আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় ছুড়ে দিল। আমি কাঁদতে কাঁদতে মার মুখটা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। মনের কোণে ছোট্ট একটা আশা ছিল সকালে উঠে দেখব ফের মিল হয়ে গিয়ে বাবা-মা আগের মতোই ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে ডিনার টেবিলে বসে।

এর আগেও বহুবার মা রাগ করে চলে গেছে, ফের ফিরেও এসেছে। কিন্তু কোনোবারই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। তা হলে সেবার কেন করল? এটা ভাবলেই বুকটা কেঁপে উঠত। তবু ভাবলাম আমাকে ছেড়ে মা আর কতদিন বাইরে থাকবে। কিন্তু শেষে সেই আশাটাও একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে থাকল। আর তারপর একদিন অবশেষে, বাবা নিয়ে এল এই দু-নম্বর বউ আর ওই কটেজ পিয়ানো। দুটোই আমার অশেষ যন্ত্রণার কারণ হল। অথচ সে-দিন সেই ভর বিকেল বর্ষা-বাদলের মধ্যে ও কী শুনলাম আমি? ...পিয়ানোয় যে-সুর বাজছিল তখন আর কোনোটাই আমার চেনা সুর নয়, অথচ সমানে মনে হচ্ছিল তাদের আমি কোথাও না কোথাও, কখনো না কখনো শুনেছি। হয়তো সেটা নিছকই মনে হওয়া কারণ ও সুর আমি সত্যিই কখনো শুনিনি। আমি আমার ঘরে বসে জানালার শার্সিতে বৃষ্টির ঝাপটা দেখতে দেখতে ওই বাজনা শুনলাম। এভাবে কতক্ষণ যে শুনেছিলাম খেয়াল ছিল না, তার মধ্যে বৃষ্টি থেমে গেছে কখন, বিকেল পড়ে সন্ধ্যে নেমে চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। আমার ঘরও অন্ধকার, কারণ আমি উঠে গিয়ে সুইচ

টেপার চেষ্টাও করিনি। তার মধ্যে বার কয়েক সত্য বাজনা থামিয়েছে, বসার ঘরের আলো জ্বেলেছে, চা করে আমার ঘর দিয়ে গেছে, তারপর ফের বসেছে গিয়ে পিয়ানোয়। আমি কখন যে কী ভাবতে ভাবতে চা আর বন রুটি খেয়েছি খেয়াল হয়নি। দীর্ঘ চটকা ভাঙল শেষে যখন বাবা এসে পিয়ানোর আওয়াজ ছাপিয়ে ওর হেড়ে গলায় খালাসিদের গান জুড়ল। আজ বলতে দ্বিধা নেই প্রিসিলা, খালাসিদের বেহেড মাতাল হয়ে বেসুরো গানের প্রতি বিতৃষ্ণা আমার সেইদিনই জন্মায়। আমাদের পাড়া জুড়ে যে বীভৎস নৈশসংগীত জন্মাবধি শুনে আসছি, সেই সুরের নৈরাজ্যের মধ্যে প্রথম এক ঝলক বসন্তের বাতাসের মতো শুনিয়েছিল সৎমার ওই প্রথম বাজনাটা। বিশৃঙ্খল ধ্বনির সমুদ্রে সুরের এক ক্ষুদ্র দ্বীপ যেন। সেই রাতেই প্রথম আমি বাবা ও তার নতুন বউয়ের সঙ্গে একই টেবিলে ডিনারে বসি। একটা পোর্ক চপ কাঁটা-চামচে কাটতে কাটতে হঠাৎ বাবার নতুন গিন্নিকে জিজ্ঞেস করে বসি, তুমি ওটা কী বাজালে বিকেলে পিয়ানোয় বসে?

সৎমা জিজ্ঞেস করল, কেন, তোমার ভালো লেগেছে?

আমি আলতো করে মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝালাম হ্যাঁ।

সৎমা বলল, ওটা একটা বিখ্যাত ক্ল্যাসিকাল পিস।

জিজ্ঞেস করলাম, ক্ল্যাসিকাল পিস কী?

সৎমা বলল, যা এমনি গান-বাজনার থেকে অনেক উপরে।

—তা হলে আমার ভালো লাগল কেন?

—কারণ তোমার মধ্যে সেই পিপাসাটা আছে।

–পিপাসা? কীসের পিপাসা?

—সুরের।

—তা কী করে মেটে?

–যদি তুমি পিয়ানো কি ভায়োলিন কি ফ্লুট শেখো। শিখবে?

—কে শেখাবে?

—কেন আমি! কিন্তু আমি তোমাকে শুধু বাজাতেই শেখাতে পারব। ক্ল্যাসিকালে আমার পুঁজি খুব কম।

—কিন্তু ওই প্রথম পিসটা তুমি আমাকে শেখাবে, হোয়াটএভার ইটস নেম।

মা বলল, ওটার নাম আ লিটল নাইট মিউজিক। এক ভিয়েনিজ প্রতিভা ওটি তৈরি করে। মোজার্ট।

আমি বিশেষ কিছুই বুঝলাম না, তাই ঠোঁটটা গোল করে শুধু বললাম, 'অ!

মা বলল, আমি দ্বিতীয় যে-পিসটা বাজালাম সেটা কিন্তু বিশেষ করে পিয়ানোর জন্য বানানো। নাম ফান্তেজি'। ওটা বানিয়েছেন যিনি তাঁর নাম শোপ্যাঁ।

আমি ফের সংক্ষেপে বললাম, 'অ!'

সে-দিন রাত্রে আমার ঘরে এল মা, আমার মাথার কাছে বসল, আর বলল, সনি, আমি তোমার মা। সম্মা-টঙ্খ নই, শুধু মা। আমি তোমাকে জন্ম দিইনি, বুকের দুধও খাওয়াইনি। কিন্তু আমি তোমাকে জীবনের সেরা দানটা দিতে চাই, প্রাণের পরই যার স্থান। গান। সংগীত। পিয়ানো। গোটা পৃথিবীটাকে তুমি দশ আঙুলের মধ্যে পাবে যেন।

এক প্রবল উত্তেজনা বোধ করলাম সারা শরীরে, আমি গায়ের লেপ সরিয়ে উঠে বসে জাপটে ধরলাম মাকে, ওর সারা গালে চুমো দিতে লাগলাম, তারপর এক নিমেষে ওর জামার বোতামগুলো খুলে ফেলে স্তনে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলাম, মা, তোমরা দুই মা মিলে একসঙ্গে থাকতে পারো না এই বাড়িতে?

মা আমার মাথাটা ওর বুকের মধ্যে চেপে ধরল বহুক্ষণ, বস্তুত আমি ঘুমিয়ে পড়া অবধি। সে-দিন ভোররাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম জন্মদাত্রী মাকে, আমার পাশে শুয়ে যুদ্ধের গল্প বলছে।

ভণিতা না করেই বলা উচিত আমার যে, আই ওয়জ আ বর্ন জিনিয়াস। মাস ছয়েক যেতে যেতেই বুঝতে পারছিলাম পিয়ানোর কি-বোর্ড আমার কথা শোনে। বছরখানেকের মধ্যে মা-র শেখানো সব লেসনকেই আমি নিখুঁত করে ফিরিয়ে দিতে পারছিলাম। ন-বছর বয়সে আমি পাড়ার চার্চের অর্গানে বসলাম। বারো বছর বয়সে পৃথিবীর সব বিখ্যাত গান আমার আঙুলের ডগায়। আঠারো বছর বয়সে আমি রেস্তরাঁয় বাজিয়ে টাকা আনছি ঘরে, বাবার মদ কিনে দিচ্ছি, মা-র ফ্রক, গাউন, জুতো। ছয় থেকে আঠারো এই বয়সটা যে কীভাবে, কখন কেটে গেল আমি যেন টেরই পেলাম না। ওই বারো বছরের স্মৃতি বলতে শুধু একটাই— পিয়ানো, আরও পিয়ানো, আরও আরও পিয়ানো।

তারপর হঠাৎ একদিন খেয়াল হল আমি কত বড়ো হয়ে গেছি, বাইশ কি চব্বিশ। আর বাবা-মা বুড়ো হয়ে গেছে। বাবার কত চুল সাদা হয়ে গেছে, একেকটা সফর থেকে যখন ফেরে আরও কিছুটা করে চুল সাদা হয়ে আসে। মা-র চুল সাদা হয় কখনো বাবার ফেরার প্রতীক্ষায়, কখনো হোটেল থেকে আমার ফেরার বিলম্বে। আধুনিক গানের পিসগুলো যখন তুলি দেখি মা আর কৌতূহল নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না শুধু বলে, দিস ইজ নট এনাফ, সনি।

না, প্রিসিলা, এভাবে আমার সারা জীবনের গল্প তোমায় শুনিয়ে কাজ নেই। বয়স হলে বাবারা মারা যায়, মায়েরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। মাও পড়েছিল। আমি চাইনি, কিন্তু উপায় ছিল না। মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসেছিলাম। তারপর থেকে ঘরটা এত থমথমে, নিষ্প্রাণ লাগত যে পিয়ানো বাজিয়ে, রেডিয়োগ্রাম চালিয়ে নিস্তব্ধতার ভূত তাড়াতাম। তোমার হয়তো মনে আছে প্রিসিলা যে, যে একবার আমার এই ফ্ল্যাটে, এই সংকীর্ণ বিছানায় আমরা দৈহিকভাবে মিলিত হয়েছিলাম, তুমি বলেছিলে, ওহ, হোয়ট আ নয়জি কট! কী বিদঘুটে আওয়াজ করে তোমার খাটটা।

আসলে খাটটার কোনো দোষ ছিল না, ঘরটাই এত থমথমে যে আশপাশের আওয়াজ বন্ধ হলে মনে হত গোরস্থানে এলাম বুঝি। তবু বলছি, আমি জীবনে কখনো ভুলতে পারব না ওই প্রথম মিলন দিনটি। আর এও ভুলব না সেই মিলনের পর তোমার আদুরে প্রশ্ন কোন যন্ত্রণা বেশি সুরেলা—তোমার ওই পিয়ানো, না আমার এই শরীর?

অমিতের অফুরন্ত জিজ্ঞাসা ছিল তোমার ব্যাপারে। তোমার কথা জিজ্ঞেস করে ও আমার মন জানতে চাইত। এখন মনে হয় তোমার চিঠিগুলো ওকে পড়তে দিলে মন্দ হত না। পাসটাস করে যখন চাকরি করছিল ‘স্টেটসম্যানে’, একটা লেখা লিখেছিল সংগীতজ্ঞদের ব্যর্থ প্রেম নিয়ে। সে মোৎজার্ট,

বেটোফেন, শ্যমান, শুবের্ট, শোপ্যাঁ কেউ বাদ ছিল না। তখন একদিন আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, মাস্টার লোবো, তুমি যখন টোনি ব্লেন্টের সামওয়ান এলস ইজ ইন ইয়োর আমজ টুনাইট' বাজাও তখন প্রিসিলার মুখ মনে আসে?

তখন প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য বলেছিলাম, তুমি তো 'মুনলাইট সোনাটা'-র লোক, তুমি আবার পপসঙে ভিড়ছ কেন?

অমিত মুখ ভার করে বসল, সত্যিই তো আমার জবাবটা তো কোনো জবাবই ছিল না। জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বুঝলে? ও ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, যা বোঝার তাই বুঝলাম যে, প্রিসিলাকে ভোলার জন্য তোমার একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা বরাবর জারি আছে। আর তুমি দোহাই পাড়ো সংগীতের।

হ্যাঁ, প্রিসিলা, আমার এই দ্বন্দ্বটা আমি ওর কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে পারিনি। হয়তো তোমার কাছ থেকেও পারিনি। তোমার কোনো চিঠিরই যে কোনো জবাব কখনো লিখলাম না, এতেই তো ধরা পড়ে গেলাম। খানিক আগে যখন বললাম যে তুমি চলে যাওয়ার পর সাত-সাতটা বছর তোমায় ভুলে ছিলাম তখনও আমার কথার অসারতা নিশ্চয়ই তোমার কানে ধরা দিয়েছে। আসলে আমি আর অমিত দু-জনেই সংগীতকে ঢাল করে নিঃসঙ্গতার আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করছিলাম। আমি আর অমিত দু-জনাই দু-জনার মাথার উপর ছাতা ধরছিলাম ভরবৃষ্টির মধ্যে। একসময় সত্যিই আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতো হয়ে গেলাম। আমরা একে অন্যের স্বপ্নও ভাগাভাগি করে দেখা শুরু করেছিলাম, প্রবীণ দম্পতির মতো। একদিন সকালে তো ও উশকোখুশকো চুলে এসে হাজির, মাস্টার, তোমার কাছে একটা কনফেশন করার আছে আমার!

আমি তো আকাশ থেকে পড়েছি-কনফেশন! কীসের কনফেশন? ও বলল, একটা স্বপ্নের ব্যাপারে।

–তা আমি কি পারি যে স্বপ্ন দিয়ে কনফেশন করব?

—কিন্তু এতে যে তুমিও আছ, মাস্টার।

—শুনি কীরকম।

-আমি ভোররাতে স্বপ্ন দেখলাম আমি প্রিসিলার সঙ্গে শুয়ে আছি, ইন দ্য অ্যাক্ট অব লাভমেকিং।

আমি ক্ষুব্ধ হয়ে ঝাঁজিয়ে উঠলাম। হোয়াট ননসেন্স! তুমি কী করে জানলে সেটা প্রিসিলা? তুমি প্রিসিলাকে জন্মেও দেখোনি। আর আমার ঘরে ওর একটিও ফটোগ্রাফ নেই।

ও প্রতিবাদ করল, না, না, মাস্টার, ওটা প্রিসিলাই ছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, কী করে বুঝলে?

—কারণ ও বারবার বলছিল, তুমি আমার থেকে আমার প্রিয়তম সনিকে ছিনিয়ে নিলে। আই হেট ইউ অ্যাণ্ড ইয়োর মিউজিক।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে আমি শেষে বললাম, তা হলে হয়তো ওটা প্রিসিলাই ছিল।

তা হলে বুঝতে পারছ, প্রিসিলা, কীভাবে বাস্তব আর স্বপ্নে আমাদের তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল? আমাদের দুজনের সত্যিকারের বাঁচার তখন একটাই পথ– সংগীত। আমরা আরও কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরছিলাম সংগীতকে। আমরা তখন মন দিয়ে শুনি বাখের ফিউগ, মোজার্টের অপেরা, মাহলারের 'সাইলেন্স', বোটোফেনের পিয়ানো সোনাটা, লিস্টের পিয়ানো পিস এবং এমনকী, শনবার্গের টুলেভ নোট স্কেল কম্পোজিশন। আমি প্রায়ই ডুব মারি হোটেলের ডিউটিতে, অমিত ডুব মারে নিউজ পেপারের শিফট ডিউটিতে। আমি কিনে নিয়ে আসি নতুন, নতুন এল পি, অমিত আনে পুরোনো, পুরোনো গানের বই। আমার রেস্তরাঁয় আমার গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, অমিতকে শো-কজ করেছে ওর সংবাদপত্র। আমরা নিজের নিজের দুঃখ ডুবিয়ে দিয়েছি গানে, মদে আর গাঁজায়। এইসবে মজে থাকি যখন একটা আমরা তখন থোড়াই কেয়ার করি জগতের সুখ-দুঃখের। অনিয়মটাই নিয়ম হয়ে যখন স্থিতাবস্থার চেহারা নিচ্ছে ঠিক তখন দিল্লি থেকে চিঠি এল ওর ভগ্নীপতির। জানিয়েছে ওর দিদির মাথার অবস্থা ভালো নয়, শি ইজ গেটিং অ্যাবনর্মাল।

একইসঙ্গে দু-দুটো আকাশ ভেঙে পড়ল দু-জনের মাথায়। অমিত দিল্লির 'স্টেটসম্যান'-এ বদলি নিয়ে চলে গেল, আর সেই প্রথম জীবনে আমার মনে হল চাকরি নিয়ে বম্বে চলে যাই। ম্যানেজার সিলভিওর সঙ্গে এই নিয়ে অনেক কথাবার্তাও হল। ও বলল, ইটস গুড দ্যাট ইউ আর লুকিং ফর আ চেঞ্জ। বছরের পর বছর কলকাতায় কাটানোর পর একটু জগৎ দেখারও দরকার আছে। তবে বরাবরের মতো বম্বে থেকে যাওয়ার কোনো মানে হয় না, ইটস নট ওয়র্থ ইট। তুমি লিয়েন নিয়ে ছ-মাসের জন্য যাও। না হলে তোমার দশাও ওই প্রিসিলার মতো হবে।

প্রিসিলার মতো দশা! আমি চমকে উঠেছি। কেন, প্রিসিলার আবার কী দশা হল!

কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না তোমার সম্পর্কে। তবে আজ কিছুটা বুঝলাম সে-দিন সিলভিও ঠিক কী বলতে চেয়েছিল। এই তুমি আমার সামনে শুয়ে আজ শিশুর মতো কুঁকড়ে, কিন্তু কোথায় তোমার সেই সাত বছর আগের নিষ্পাপ চোখ-মুখ নিঃশ্বাস? তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যেও এখন ক্লান্তির লয়। তোমার ঘুমও প্রকৃত ঘুম নয়, ঘোর। যেকোনো মুহূর্তে, আশঙ্কা হয়, তুমি উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে ফের বলবে, আমায় একটু রাম দাও, ঘুমের বড়ি খাব।

কিন্তু আর ঘুমের অপেক্ষা করে কাজ নেই। দিনের প্রথম আলো এই এসে পড়ল তোমার মুখে। নতুন একটা দিন শুরু হল, এবার তোমার মুখে শুনব তোমার সাত বছরের জীবনকাহিনি। আমি ঘুমের মধ্যে তোমার সব কথা শুনতে পাব। যদি কখনো মনে হয় বড় বেশি তলিয়ে গেছি স্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে আমায় ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিও।

কিন্তু কই? তুমি তো উঠছ না! মুখে এতখানি রোদ মেখে কেউ ঘুমিয়ে থাকতে পারে? এ আবার কী ঘুম তোমার প্রিসিলা? এসব ঘুমে তো জীবনের সব স্মৃতি মুছে যায়। তুমিও শেষে সেই অমিতের মতো করে বসলে তো?

৩.

সনি লোবো বসেছিল প্রিসিলার মাথার কাছে। কোমা থেকে এখনও জেগে ওঠেনি মেয়েটা, যদিও ডাক্তারের ধারণা এবারের মতো ও বেঁচে গেল বলে। পেট থেকে পাম্প করে মদ ও ঘুমের বড়ি বার করে দিলেও ওর ঘুমটা যেন

কাটতেই চায় না। ভিজিটিং আওয়ার্সে ক্যাম্বেল হাসপাতালের এই ওয়ার্ডটা যেন খেলার মাঠ হয়ে যায়। ভিজিটরদের কথাবার্তায় অ্যাত্তো বড়ো হলটা গমগম করে, যেন রাইটার্স বা কর্পোরেশনের ফ্লোর। যত নিস্তব্ধতা যেন প্রিসিলার এই বেডের পাশে। মেয়েটা ঘুমে অচেতন আর লোবো ওকে নির্নিমেষ দেখেই যায়।

ক্যাম্বেলে আজ তৃতীয় বিকেলে লোবো এসে প্রিসিলার মাথার কাছে বসেছে। প্রিসিলা চোখ মেলবে কি না, কথা কইবে কি না জানা নেই। কিন্তু প্রিসিলার কন্ঠস্বর ওর মাথার মধ্যে বাজছে। কারণ সাতবছর ধরে না পড়ে ফেলে রাখা চিঠিগুলো আজ ও সঙ্গে এনেছে পড়বে বলে। তিনটে চিঠি শুধু খামে। বাকি ষোলো-সতেরোটা নীল ইনল্যাণ্ডে। অনেকক্ষণ ধরে কিছু লেখার অভ্যেস প্রিসিলার কোনো কালেই ছিল না, ও ভালোবাসত অনর্গল কথা কইতে নয়তো গান গাইতে।

লোবো একেবারে প্রথম দিকের একটা চিঠি খুলল। নানারকমের ভুল বানানে প্রিসিলা লিখছে:

আমার চিঠির উত্তর পাইনি, তবু লিখছি। আমি ছেলেবেলার অনেক অভিজ্ঞতা থেকে একটা জিনিস শিখেছি—প্রেম কোনো টু ওয়ে টিকিট নয় যে গেলাম আর ফিরে এলাম। এটা একমুখী টিকিট, ফলে শুধু যাওয়া আর যাওয়া। আমি সেই যে যাওয়া শুরু করেছিলাম তোমার হৃদয়ের দিকে সে-যাওয়া আমার শেষ হল না।

অথচ তুমি আমার গন্তব্যপথ থেকে সরে গেলে, সরে যাচ্ছ। তুমি বলবে বম্বের দিকে পা বাড়িয়ে আমি পথ হারিয়েছি। হয়তো; কিন্তু তুমি পারতে না আসতে বম্বে? কী দিয়েছে। তোমার কলকাতা? বম্বেও শেষমেশ হয়তো কিছুই দেবে

না, কিন্তু টাকা? খ্যাতি? ঢের বেশি উন্নতমানের জীবনযাত্রা? জানি তুমি বলবে, বিনিময়ে যা হারাব সে-তুলনায় এসব কিছু নয়। কিন্তু চলে আসার দিনও আমি ভাবতে পারিনি ওই সামান্য সময়টুকুও তুমি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে। সেই সময়টা ফুরিয়ে আসছে, কিন্তু তুমি আমাকে ফেরার জন্য তাগিদ দিয়ে একটাও চিঠি লিখলে না। তুমি কি আমার চিঠিগুলো পড়োও না? আমার চলে আসাতে তোমার যে এত অভিমান, এত ক্ষোভ তার এতটুকু আঁচও তো আমি পাইনি আসার দিন। তোমার চুম্বন থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম তোমার মনে ব্যথা আছে, কিন্তু ক্ষোভ?

ছিঃ, আমি এসব কী গুরুগম্ভীর হাবিজাবি লিখছি। এভাবে তলিয়ে ভাবার স্বভাব তো তোমার। আমি তো কেবল দুমদাম ভাবি আর বলি। তুমি জানো না বোধ হয় বম্বেতে কেউ একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে হাঁ করে দেখে না। সেভাবে ইজ্জতও করে না। কলকাতায় আমরা তাচ্ছিল্য ও সম্মান দুটোই পাই, যেটা ভালো। বম্বেতে হারিয়ে যাওয়া বড়ো সহজ; তবে ভয় করো না, আমি হারিয়ে যাব না। তবে তুমি একবার অন্তত ভুল করেও বম্বে এসো। দেখবে এখানে তোমার মতো একটিও পিয়ানিস্ট নেই। আমি সবাইকে তোমার কথা বলি, আর সবাই বলে, হোয়াই ইজ হি রটিং ইন ক্যালকাটা! ও কলকাতায় পচছে কেন?—

তোমার প্রিসিলা

এর বেশ কিছুকাল পরের একটা চিঠি খুলল লোবো। প্রিসিলা লিখছে :

আমি আর তোমার চিঠি আশা করি না। তবু মনের কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাই লিখছি। বম্বেতে এই দেড় বছরেও মনের কথা বলার লোক জোটেনি। তা হলে বুঝছ তো শহরটা কীরকম? আত্মার স্পর্শ বড়ো কম, শুধু দেহের লীলা। এর আগের চিঠিতেই আমি লিখেছিলাম হোটেলের কর্তার ছোটোভাইয়ের সঙ্গে

আমি ফেঁসে গেছি। ফলে খুব সুখেই আছি বলতে পারো। অন্য লোকের থাবা থেকে বাঁচানোর জন্য নরিন্দর আমাকে একটা সাদা স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড উপহার দিয়েছে। ভাবতে পারো, একটা ব্রাণ্ড নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড!

কিন্তু সনি, সত্যি বলছি। আমি সুখী নই। কালরাতে আমি প্রচুর ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আর জাগব না। কিন্তু প্রচন্ড মাথাব্যথা আর গা-বমি ভাব নিয়ে জাগলাম। আজ আর হোটেলে গেলাম না, ইচ্ছে হল তোমাকে চিঠি লিখি। একটা ছোট্ট দায়িত্ব দিলে রাখবে? শুনেছি ভাই ক্লেটন পড়শুনোয় ঢিলে দিয়ে বসেছে, বদ সঙ্গে পড়েছে। ও সত্যি কী করছে, কী করে একটু খোঁজ নিয়ে জানাবে?

-তোমার প্রিসিলা

এবার অনেক লম্বা একটা চিঠি বাছল লোবো। তাতে প্রিসিলা আবার অন্য মুডে। ইংল্যাণ্ডে গান গেয়ে একটাই উপকার হল আমার—বুঝলাম ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডার্ডের তুলনায় আমরা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। আমরা সত্যিই খারাপ না, কিন্তু ও দেশে হারিয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না। একটা ক্লিফ রিচার্ড কি এঙ্গেলবার্ট হাম্পারডিঙ্ক দিয়ে কিছুই প্রমাণ হয় না। কিন্তু ওখানকার কোনো বারে, রেস্তরাঁয়, হোটেলে, নাইটক্লাবে আমি তোমার স্তরের একটা পিয়ানিস্ট দেখিনি। পিয়ানোর তোমার আঙুলের দৌড়ঝাঁপ যেন জিপসির নাচ। তিনমাস ইংল্যাণ্ডে কাটিয়ে আমি যেন নতুন করে তোমার প্রেমে পড়লাম।

প্রিসিলার মুখে আর নিজের প্রশংসা শুনতে ভালো লাগছিল না। ও বিলিতি খামে চিঠিটা ভরে দিল বাকিটুকু না পড়ে। আর বার করল অনেক পরের একটা চিঠি। প্রিসিলা লিখছে :

আমি ক-দিন হল কলকাতা ঘুরে এলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করলাম না। বলতে পারো তোমার সঙ্গে দেখা করার মুখ ছিল না আমার। আই ওয়জ ক্যারিং মিকি'জ চাইল্ড। মিকিকে তুমি চিনবে না, ওর বাবার হোটেল সাম্রাজ্য। আমি নরিন্দরের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে ওর সঙ্গে ফিরে এসেছিলাম। নরিন্দর আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু ছেলেপুলে চায়নি। মিকি আমায় সন্তান দিল। কিন্তু বিয়ে করতে অস্বীকার। অ্যাণ্ড আই ড্ডি নট ওয়ন্ট আ ফাদারলেস চাইল্ড। তাই কলকাতা গিয়েছিলাম যাকে বলে পেট খালাস করতে।

বলা বাহুল্য, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিনি। —প্রিসিলা

চিঠিটা শেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল লোবো। একবার ভাবল, চিঠিগুলো আগে না পড়ে ভালোই হয়েছে। ফের ভাবল বড্ড দেরি হয়ে গেল বুঝি। অন্তত শেষ চিঠিটা যদি আগে...

লোবো ফের একটা চিঠি খুলল। দেখল চিঠি নয়, আর্তনাদ। প্রিসিলা লিখছে:

অ্যাট লাস্ট আই অ্যাম দ্য পার্ফেক্ট হোর। প্রকৃত বেশ্যা। আমার কোনো স্বাদ-বর্ণ-অনুরাগ নেই। আমার মূল্যবোধের ভাঁড়ার শূন্য। আমার গানের গলা এখন যাও বা আছে, গানের ইচ্ছে একেবারেই নেই। তবু ফি-সন্ধ্যে হোটেলের ফ্লোরে নেচে-কুঁদে কত যে কী ছড়াই। একটিও লাভ সং-এর মধ্যে আমার বুকের দরদ মেশে না। স্বভাবে গাই। অভ্যেসে গাই, আর কিছু করার নেই বলে গাই। ক্লেটন এসেছিল আমায় কলকাতায় নিয়ে যেতে। বলল বাবা চোখে দেখতে পায় না একদম, অপারেশনে কাজ হয়নি। মা শুধু আমার নাম করে আর কাঁদে। বললাম, তুমি ছেলে, তুমি থাকতে আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?

কলকাতায় ফিরে আর আমি তোমাদের কী কাজে আসব? এখানে থেকে তবু তো টাকা পাঠাতে পারছি। কলকাতার হোটেল-রেস্তরাঁয় এ পয়সা কে দেবে?

ক্লেটন বলল, বাবা-মা তোমার সঙ্গ চায়। টাকার পরিমাণটা না হয় কমই হল। জিজ্ঞেস করলাম, আর তুমি নমো নমো করে কিছু টাকা বাড়িতে দিয়ে উড়ে বেড়াবে? তুমিই বা বিয়ে করছ না কেন, যদি বাড়িতে একজন মহিলারই দরকার থাকে এতটা? ক্লেটন করুণ মুখে বলল, আই কানট প্রিসিলা। আমি সন্ন্যাসী হব ঠিক করেছি। সেজন্যই তো তোর কাছে আসা। ফাদার ক্লয়াম বলেই দিয়েছেন, বাড়ির সবার অনুমতি নিয়ে তবেই এ পথে এসো।

জিজ্ঞেস করলাম, তুই বাবা-মা-র অনুমতি নিয়েছিস? ও বলল, এখনও নয়। সেটা তুই-ই আদায় করে দে। প্লিজ!

হঠাৎ লোবো নজর করল ঘুমের মধ্যে মস্ত মস্ত শ্বাস নিচ্ছে প্রিসিলা। দেখে মনে হচ্ছে স্প্যাজম হচ্ছে। লোবো উঠে ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিল, মাঝপথে ওয়ার্ডের মুখে দেখা হয়ে গেল নার্স মিস দত্ত-র সঙ্গে। লোবোর কথা শুনে মৃদুলা দত্ত বললেন, ওটা স্প্যাজম নয়। ওটা হয় এই স্টেজে। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। লোবো ফিরে গিয়ে বসল প্রিসিলার মাথার কাছে। দেখল ফের সেই গভীর ঘুমে ঢলে আছে মেয়েটা। মুখের প্রশান্তি ফিরে এসেছে।

লোবো ফের একটা চিঠি খুলল, এবার একটা খামের চিঠি। চিঠিটা যখন হাতে আসে বছরখানেক আগে ওর বড্ড ঝোঁক হয়েছিল সেটা খুলে দেখার। তার কারণটাও অদ্ভুত। ওয়র্ল্ড মাদারস ডে, জননী দিবসের একটা স্ট্যাম্প ছিল খামটায়। তাতেই কীরকম একটা আনচান ভাব হল ভিতরে, কিন্তু দীর্ঘ অভ্যেসের জোরে সেই কৌতূহলও দিব্যি দমন করেছিল লোবো। লেটারবক্স

থেকে বার করে অনেকক্ষণ সেটা দেখার পর ও একবার ঘুরিয়ে প্রেরকের নামটা দেখতে গেল। কিন্তু সেখানে কিছু নেই; কিন্তু হাতের লেখাটা যাবে কোথায়? এ লেখা তো নিজের হাতের লেখার মতোই চেনা ওর। ও চিঠিটা নিয়ে গিয়ে দেরাজে বাকি চিঠিগুলোর সঙ্গে রেখে রবার ব্যাণ্ড পরিয়ে দিল।

এটাই সম্ভবত প্রিসিলার শেষ চিঠি। এই চিঠিটাই কি পড়ার চেষ্টা করেছিল অমিত? লোবোর ঠিক মনে পড়ে না। যদি তা না হয় তা হলে এর খামটা এত নিপুণভাবে কাটা কেন? না, না, না, অমিত এ চিঠি খোলেনি, অনেকদিন আগে সেই নিষেধের পর তা কখনো কোনো চিঠি ছোঁয়নি। নাকি নিঃশব্দে, চুপিসাড়ে পরে কখনো সত্যি একটু চেখে দেখতে চেয়েছে ওর লোবো মাস্টারের জীবনের রহস্য!

পিপাসা প্রচন্ড বেড়ে উঠেছিল লোবোর মধ্যে। চিঠিটাকে শুধু হাতে ধরে এই উৎকন্ঠা সহ্য করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল। ও চিঠিটা বার করে পড়তে লাগল এবং একটু পর সম্পূর্ণ থমকে গেল এক জায়গায়-কথায় বলে বাস্তব কল্পনার চেয়েও অবিশ্বাস্য। কিন্তু এ কী বাস্তব, সনি? মাদকাসক্তি থেকে রেহাই পেতে দাদারের যে-রিহ্যাবিলিটেশন ক্লিনিকে ভর্তি হলাম তার বৃদ্ধা মেট্রন একদিন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যে বলো তুমি কলকাতায় গান গাইতে, তা কখনো সনি লোবোর পিয়ানো শুনেছিলে?

ভাবো সনি, এ মহিলাকে কী করে বোঝাই সনি লোহোর পিয়ানো আমি কীভাবে শুনেছি? তাই সরাসরি কিছু না বলে ওঁর কৌতূহলটাই খতিয়ে দেখছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, সনি লোবোর কথা বললেন কেন, আপনি ওর বাজনা শুনেছেন?

বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সে-সুযোগ আর হল কই? আমি তো স্বাধীনতার বছর ১৯৪৭ থেকেই কলকাতা ছাড়া।

জিজ্ঞেস করলাম, তা হলে ওর কথা কোথায় শুনলেন?

বৃদ্ধা আমাকে ওষুধ গেলাতে গেলাতে বললেন, কতজনই তো আসে কলকাতা থেকে। তারা ওর পিয়ানোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমার বাড়িউলি একবার কলকাতায় ওর বাজনা শুনে এসে বললেন, ওহ হি ইজ আ জিনিয়াস! তখন খুব সাধ হয়েছিল একবার কলকাতায় গিয়ে ওর বাজনা শুনব। কিন্তু কোথায় আর হল!

জানো সনি, সে-দিন বৃদ্ধার ওই কথাতেই যেন অনেকটা ভালো হয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে শুইয়ে দিয়ে লাইট নিভিয়ে বৃদ্ধা যখন চলে যাচ্ছেন, আমি কী এক আবেগে বলে বসলাম, মিসেস ড্রেটন, আমি সেরে উঠলে আপনাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাব। চাইলে সনি লোবোর বাড়িতে বসিয়েই আপনাকে ওর পিয়ানো শোনাব।

ওই আবছা অন্ধকারেই আমি যেন দেখলাম বৃদ্ধার চোখ দুটো অসম্ভব বড়ো হয়ে উঠল। আবেগে কেঁপে ওঠা গলায় বললেন, তুমি সনি লোবোকে এতখানি চেনো?

আমি গর্বিত হাসি হাসলাম-ইয়েস মিসেস ডেট্রন।

এরপর কেন জানি না আমাকে সারিয়ে চাঙ্গা করার গোটা দায়িত্বটাই তুলে নিয়েছিলেন মিসেস ডেট্রন। আট সপ্তাহ পর আমি চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। ক্লিনিক

থেকে চলে আসার আগের দিন বৃদ্ধা বললেন, তোমার গান একদিন আমি শুনতে যাব হোটেলে।

হেসে বললাম, কেন, সনি লোহোর পিয়ানো শুনতে যাবেন না আমার সঙ্গে কলকাতায়?

বৃদ্ধা ম্লানস্বরে বললেন, আই অ্যাম টু ওল্ড। ওই ধকল বোধ হয় আমার আর সহ্য হবে না। মিস্টার ড্রেটন চলে যাওয়ার পর শুধু নিজের পেট চালাতেই কি আর কম পরিশ্রম গেল। দেখছ না এই বয়সেও কী যাচ্ছে শরীরের উপর দিয়ে?

বুকের মধ্যে কীরকম মোচড়াতে লাগল আমার। মনে পড়ল আমার নিজের বৃদ্ধ বাবা-মা-র কথা। জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, কেন, আপনার ছেলেপুলে নেই?

মুখটা নিভে এল বৃদ্ধার—না, আমাদের কোনো সন্তান নেই।

আমার মুখ ফসকে আপনা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তাই!

বৃদ্ধা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বোঝালেন হ্যাঁ, তারপর আনমনে অস্ফুটে বললেন, তবে একেবারেই যে আমি মা হইনি তা নয়। আমার প্রথম বিবাহের একটা সন্তান আছে।

বললাম, সে কোথায়?

বৃদ্ধা বললেন, কলকাতায়।

—দেখতে ইচ্ছে করে না?

–খুব।

—নাম, ঠিকানা দেবেন? আমি ব্যবস্থা করব।

—দেওয়ার দরকার নেই, তুমি তা জানো।

–আমি জানি? কে সে?

–সনি লোবো!

সনি ডার্লিং, তোমার মা-র কাছে আমার এই সম্মানটুকু রাখবে না?

প্লিজ, প্লিজ ডার্লিং, একবারটি বম্বে এসো। একবারের জন্য তোমার মায়ের মাথার কাছে বসে তোমার ইলেকট্রিক পিয়ানো বাজাও। তাতে বৃদ্ধার সারা জীবনের ক্লান্তি মুছে যাবে। শি উইল ডাই আ হ্যাপি ডেথ। আর আমি পৃথিবীর সেরা সুখী মানুষ হয়ে থাকব চিরদিন। ইয়োর্স ফরএভার—প্রিসিলা।

লোবোর জীবনে দ্বিতীয় রহস্যটা এইমাত্র ডানা মেলল। প্রথম রহস্যটা ছিল ওর দিদি সাততলার থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার পরও সাত মাস কেন দিল্লিতে পড়ে রইল অমিত। ওর দিদির মৃত্যুর খবর পোববা জানল অমিতের মৃত্যুর পর। দিদির মৃত্যুর পর একটা চিঠিও অমিত লেখেনি লোবোকে। যদিও তার মধ্যে লোবো অন্তত তিনটে চিঠি লিখেছে। অবশেষে নিজের মৃত্যুর দিনে ওই ভয়ানক চিঠিটা লিখল অমিত।

লোবোর জীবনের দ্বিতীয় রহস্য বিধবা হওয়ার পর এত কষ্ট করল মা, কিন্তু ছেলেকে একটিবারের জন্য কিছু জানাল না! মা তো ছেলের সব খবরই রেখেছে বিদেশ-বিভুইয়ে বসে, বাড়ির ঠিকানা তো তার নিজেরই এককালের ঠিকানা। তবু?

লোবো চিঠিগুলো সযত্নে ওর ফোলিওব্যাগে ঢোকানোর সময় দেখল গভীর জড়তার ভিতর থেকে চোখ খোলার চেষ্টা করছে প্রিসিলা। মেয়েটার ঘুম ভাঙল তা হলে?

ঘুম ভাঙা যাকে বলে সেটা চতুর্থদিনে হয়েছিল প্রিসিলার। লোবোকে বলল, আমার হ্যাণ্ডব্যাগে একটা চিঠি আছে একজনের। আমি চাই তুমি সেটা পড়ো। ওই চিঠিটাই আমার অনেক কথাই বলে দেবে। আমি নিজে আর গুছিয়ে কিছু বলতে পারব না। আমার সব স্মৃতিই ক্রমশ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে প্রিসিলার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বেরুল খামে-আঁটা চিঠিটা। প্রিসিলাকে ‘ডিয়ার প্রিসিলা’ সম্বোধন করে দিল্লি থেকে লিখেছে অমিত রে। পড়তে পড়তে হাত দুটো কাঁপতে লাগল লোবোর; ওর মনে হল বুঝি-বা পিয়ানোর আঙুলগুলো ফের নিথর হয়ে প্রাণ হারাবে। আস্তে আস্তে দু-চোখে জল ফুটতে লাগল লোবোর, ওর পুরোনো কোমরের ব্যথাটা ফের চাগাড় দিতে লাগল। অমিত লিখছে...

প্রিয় প্রিসিলা,

তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমায় তোমাকে চিনতেই হয়েছে। তোমার ঠিকানা পেয়েছি ছোট্ট একটা পাপকর্ম করে, কারণ আমার হাতে আর সময় বিশেষ ছিল না। গত পরশু আমি কলকাতা থেকে দিল্লি এসেছি, আর জানিও না ফের সনি লোবোর শহরে ফিরে যেতে পারব। তুমি ছেড়ে যাওয়ার পর

সাত-সাতটা বছর লোবো মাস্টারকে আঁকড়ে ধরে বেঁচেছিলাম, আজ এক দুর্বোধ্য শূন্যতায় নিজেকে নিক্ষেপ করতে হল। আমি কিন্তু চাইনি লোবো মাস্টারকে একলা ফেলে চলে আসতে। কিন্তু আসতেই হল নিজের প্রিয় দিদির জীবনরক্ষার চেষ্টা করতে। এক ব্যর্থ বিবাহ থেকে বেচারির মাথাটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আর এর জন্য অংশত আমিও দায়ী। গোটা পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে ওর এই বিয়েতে মত দিয়েছিলাম শুধু আমি। আজ গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ওকে পাগলা গারদের বাইরে ধরে রাখতে হবে আমায়। কারণ সমাজ চাইছে শর্মিলা অ্যাসাইলামে যাক।

বুঝতে পারছ, প্রায় নিরুপায় হয়েই তোমার চিঠি খুলেছি। গত সাত বছরে লোবো মাস্টার তোমার একটি চিঠিও খুলে পড়েনি। তাই ও জানেন না যে ওর জন্মদাত্রী মা প্রায় ওর অপেক্ষাতেই প্রহর গুনছেন দূর বোম্বাইয়ে। কিন্তু লোবো মাস্টার কখনো কলকাতা ছেড়ে বোম্বাই যায় না। যত অসমর্থ হন তবু একবার তুমি ওর মা-কে নিয়ে কলকাতা যাও। মাস্টারের হাতে রাতের সংগীত শোনাও ওর মাকে। উনি মর্ত্যে চাক্ষুষ করতে পারবেন স্বর্গ।

আর তারপর তুমি আর কখনো ছেড়ে যেও না মাস্টারকে। মানুষটা ভেতরে পুড়ে খাক হয়ে আছে, শুধু গান দিয়ে ভরে রেখেছে সমস্ত শূন্যতা।

তুমি বলবে আমি এত সব জানলাম কী করে? খুব ছোট্ট উত্তর এর...সংগীত। মাস্টারের বাজনা যেকোনো বাজনা।

আর যদি জিজ্ঞেস করো আমি তোমার কথাও এত জানলাম কোত্থেকে তো বলব, ওই সংগীত। মাস্টারের সব বাজনাই শেষ অবধি ওর দুই মা আর তোমার জন্য নিবেদিত। এ আমি সম্যক জানি। কদিন আগে অব্দি আমিও যে ওই বাজনার অংশ ছিলাম!

প্রিয় প্রিসিলা, মাস্টারের এই সংগীত তুমি বন্ধ হতে দিও না। তোমার এক অনুরাগী।

—অমিত রে

চিঠি শেষ করে সনি লোবো পিয়ানোয় বসল, একটু একটু রাম খেতে খেতে বাজাল বহু রাত অব্দি। তারপর হঠাৎ একসময় টেলিফোন বেজে উঠল সজোরে। এত রাতে কার ফোন? কোনো মতে পা দুটো টেনে টেনে ফোনের কাছে গেল লোবো।

—হ্যালো।

–মিস্টার লোবো আছেন?

–মিস্টার লোবো বলছি।

—স্যার, ক্যাম্বেল হাসপাতাল থেকে বলছি। আপনার ওয়ার্ড মিস প্রিসিলা রোজ ইজ ফাস্ট সিংকিং! আপনি এক্ষুনি চলে আসুন।

ভোর পাঁচটায় সূর্যোদয়ের সামান্য আগে ক্যাম্বেল হাসপাতালে প্রিসিলার জীবনতরী ডুবে গেল।

৪.

ফাদার ব্রায়ান ল্যাটিন বাইবেল থেকে পড়ে একটু পাঠ করলেন কিং জেমস ভার্সানের ইংলিশ বাইবেল থেকে। রৌদ্রস্নাত অপরাহে উপস্থিত সবাই মাটি দিল প্রিসিলার কফিনে। কবর মাটি চাপা পড়ার পর ডুকরে একটা কান্না

শোনা গেল পুরুষকণ্ঠে। সচকিত হয়ে সবাই ঘুরে দেখল সেটা ভাই ক্লেটন। পাদরি সাদা পোশাকে ছেলেটাকে কী সৌম্য দেখাচ্ছিল। কিন্তু ওই সৌম্য মুখটার পিছনে এত কান্না! এর আগে সিমেটারির কেউই একজন পাদরিকে এভাবে কাঁদতে দেখেনি। লোবো হেঁটে গিয়ে ক্লেটনের পিঠে হাত রেখে বলল, তোমার চোখে জল দেখে আমার ভালো লাগছে। যখন বেঁচেছিল প্রিসিলা তখন কেউ যে এই কান্নাটা কাঁদেনি বেচারির জন্য।

ক্লেটন ভাঙা গলায় বলল, আমি ওর মূল্য বুঝিনি কোনোদিন। শুধু স্বার্থপরের মতো নিজের সুখ দেখেছি। যা চেয়েছি জীবনে ও অকাতরে দিয়ে গেছে। একবারই শুধু প্রত্যাখ্যান করেছিল আমায়—আমায় সন্ন্যাস নেবার অনুমতি দেয়নি।

লোবো বলল, তবু তুমি সন্ন্যাসী হলে?

ক্লেটন মুখ নীচু করে কাঁদছিল। লোবো ওর কাঁধে ফের হাত রেখে বলল, কাঁদো। আমি চললাম, আমারও অনেক কান্না বাকি আছে।

সিমেটারি থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে লোবো ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স অফিসে গিয়ে একটা বম্বের টিকিট কিনল। সিঙ্গল টিকিট। সারা জীবনে এত প্রলোভন সত্ত্বেও ওর বম্বে যাওয়ার জন্য মন সরেনি। কিন্তু আজ ওই জায়গাটায় গিয়ে পড়ার জন্য ওর তর সইছে না। কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি প্লেনে যাওয়ার জন্য, অনায়াসেই ট্রেনে যাওয়া যেত। কিন্তু লোবোর মনে হচ্ছে ওর সময় বড়ো কম।

পরের দিনের ফ্লাইটের টিকিট কিনে লোবো বাড়ি ফিরল। ব্যাঙ্কের পাশবই বার করে কোটের পকেটে রাখল। কাল সকালে সেভিংস অ্যাকাউন্টের

টাকাগুলো তুলতে হবে। কয়েকমাসের জন্য অন্তত বাড়িভাড়া অ্যাডভান্স করে যেতে হবে। কাজের মেয়ে শীলাকেও কিছু টাকা দিয়ে যাওয়া দরকার। ফোন বিল, ইলেকট্রিক বিলের জন্যও কিছু টাকা রেখে যেতে হবে ওর কাছে। আর মিটিয়ে যেতে হবে মুদির বকেয়া টাকা।

লোবো ওর স্যুটকেস গোছাল। পুরোনো একটা ট্রাঙ্ক থেকে বার করল ওর আর প্রিসিলার একটা পুরোনো ছবি। এক সন্ধেয় ম্যাজেস্টিকে কী একটা বাজে হিন্দি ছবি দেখে ওয়েলেসলির একটা স্টুডিয়োয় তুলেছিল। লোবো নিল ওর বাবা আর দুই মায়ের ছবি। তারপর একটা অ্যালবাম থেকে টেনে ছিড়ল অমিতের সঙ্গে ওর একটা ছবি। অমিতের দিদির বিয়েতে তোলা। স্যুটকেসে জামাকাপড় ঢোকানো শেষ হয়ে গেলে লোবো তাতে যত্ন করে রাখল ছোট্ট দুটো বই। একটা অমিতের উপহার দেওয়া মোজার্টের জীবনী। আরেকটা প্রিসিলার উপহার একটা ছোট্ট প্রেমের উপন্যাস—এরিফ সেগালের 'লাভ স্টোরি'। যার একটা লাইন প্রিসিলা প্রায়ই আওড়াত; লাইনটা লোবোরও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল ক্রমে, আর তারপর আর কখনো Oh Love is never having to say you're sorry.

পরদিন সন্ধ্যের ফ্লাইটে বম্বের দিকে যাত্রা করল প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের সনি লোবো। কলকাতার মস্ত সুনাম ফেলে রেখে বম্বের অজানা জগতে নতুন করে ভাগ্যান্বেষণে নামতে হবে এখন ওকে। সেখানে ওর প্রিয়তম ক্ল্যাসিকাল আইটেম বাজানোর কোনো সুযোগ নেই। রুজির জন্য বিটলস, এলভিস, অ্যাব্বা কি হালফিলের সব রকমারি সুর বাজাতে হবে। আশির দশক বলে কথা!

তা হোক। ভিতরে ভিতরে ঘুমিয়ে থাক মোজার্ট, বেটোফেন, ব্রাহমজ। রাতে অন্তত মা-র জন্য সামান্য একটু নৈশসংগীত বাজাতে পারলেই হল। এই মা

ক্ল্যাসিকালের ক জানেন না, অথচ কতকাল ধরে পিপাসী হয়ে আছেন সনির পিয়ানো শুনবেন বলে। মাকে আর কাজে যেতে দেবে না লোবো। মা-র এখন একটাই কাজ—সনির পিয়ানোর অপেক্ষা থাকা। তখন সনি 'আইনা ক্লাইনা নাখটজিক', 'নকতন', 'র‍্যাপসোডি', 'ফান্তেজি', কি 'মুনলাইট সোনাটা' যাই বাজাক না কেন, তাই শুনতে শুনতে ঘুম আর স্বপ্নের জগতে হারিয়ে যাওয়া।

লোবো বাইরে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। বাজনাগুলোর কথা মনে হতে হাতের লেদারব্যাগটা খুলে দেখে নিল অমিতের দেওয়া নোটেশন বইগুলো ঠিকঠাক আছে কি না।

দেখল সব ঠিকই আছে জায়গামতো। বিমানসেবিকা এসে স্ন্যাকস আর কফি দিয়ে গেছে। ও কফিতে চুমুক দিতে দিতে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাল। অন্ধকারটা ভীষণ ভালো লাগল ওর, ও গুনগুন করে একটা সুর গাইতে লাগল কোনো ক্ল্যাসিকাল সুর নয়, রোমান্টিক পপ। ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রার 'স্ট্রেঞ্জার্স ইন দ্য নাইট, টু লোনলি পিপল'।